ভারতের মুক্তি
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭
২৮শে শ্রাবণ ১৩৫৪

বৃন্দাবন ধর এ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ
৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা
স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস্ ঢাকা

## লিখেছেন

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেশ মৈত্রেয়

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রীনরেশ গুহ

শ্রীস্নেহকণা গঙ্গোপাধ্যায়

**সম্পাদনা করেছেন**

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

**প্রকাশ করেছেন**

বৃন্দাবন ধর এ্যাণ্ড সন্স লিঃ

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৮।৬, লায়েল স্ট্রীট, ঢাকা

**ছেপেছেন**

শ্রীনন্দগোপাল ঘোষ

**উৎপল প্রেস**

১০।১, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা

**প্রথম মুদ্রণ**—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

**দ্বিতীয় মুদ্রণ**—বৈশাখ, ১৩৫৭

'স্বাধীনতার অঞ্জলি' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস। 'শিশুসাথী'র স্বাধীনতা সংখ্যায় এর অনেকগুলি প্রবন্ধ বের হয়েছিল। সেগুলি সংকলিত করে এবং আরো নূতন প্রবন্ধ যোগ করে 'স্বাধীনতার অঞ্জলি' কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রকাশ করা হলো। আশা করা যায় গ্রন্থখানি পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগবে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টায় অর্থাৎ ইংরেজি মতে ১৫ই আগষ্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। বাংলা মতে সেদিনটা ছিল ২৮শে শ্রাবণ। পাঠক-পাঠিকাগণ এ পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করবেন।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের যিনি ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক, আততায়ীর গুলিতে তিনি স্বাধীনতা লাভের অল্পদিন পরেই (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮) নিহত হয়েছেন। আমরা সেই লোকাতীত পুরুষ মহাত্মাজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি।

মহাত্মা গান্ধী

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন:তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে
লউক বিশ্ব-কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব, তব দুর্জয় আহ্বান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

বিঘ্ন-বিপদ-দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু-গহন পার হইল টুটিল মোহ-কারা!
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্য বাহু কর্ম্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

নূতন যুগ-সূর্য উঠিল; ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অংগন ভরি মিলিল সব যাত্রী।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নব সমাজমাঝে,
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

জনগণ-পথ তব জয়রথ-চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শংখ বাজি!
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্তভাব, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি মৌন কণ্ঠে পূর্ণ বাণী কর দান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে।

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশো কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হানো অশনিপাতে।
ছায়াভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধন-রতন,
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অংগ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই ও দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা কর্‌বো ভাই !
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরে জিনিস পাই।

—রজনীকান্ত সেন

# জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ব্যবসা করতে করতে কোম্পানি হয়ে পড়ল বাংলা দেশের মালিক—পলাশীতে নামমাত্র যুদ্ধ করে। দেশদ্রোহী ও রাজদ্রোহী মীরজাফরের দল বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনার বাংলাকে তুলে দিলে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে একদল ইংরেজ বণিকের হাতে—যাদের না ছিল কোন নীতিজ্ঞান, না ছিল কোন ধর্ম্মজ্ঞান, না কোন শাসন-বিধির বালাই। একদিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের নামে দেশের অর্থ শোষণ করা, আর একদিকে শাসনের জন্য খাজনা আদায়ের নামে প্রজার ধন-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজের উদর স্ফীত করাই ছিল কোম্পানির বিলাতী শাসন-কর্ত্তাদের মূলনীতি। ফলে দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বাংলার তিন কোটি লোকের মধ্যে এক কোটি লোক গেল মরে। যারা দুর্ভিক্ষের কবল থেকে পাকেচক্রে রক্ষা পেল, বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ সাহেব তাদের রক্ত চুষে

খাজনা আদায় করল পুরাপুরির চেয়েও ঢের বেশি। যারা তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে গেল, তাদেরই নানা ভাবে বিব্রত করতে লাগল হেষ্টিংস্। মহারাজ নন্দকুমারকে তো এক জাল দলিলের মামলায় দাঁড় করিয়ে ফাঁসীর দড়িতেই ঝুলিয়ে দিল সে।

এদিকে দেশের শিল্প বাণিজ্য সবই কোম্পানির হাতে। তাঁতীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের দিয়ে জলের দামে কাপড় বুনিয়ে বিলাতে তা সোনার দামে বিক্রি করতে লাগল কোম্পানির অর্থপিশাচ কর্ম্মচারীরা। এদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য অনেক তাঁতী হাতের বুড়ো আঙুলই কেটে ফেললে। এর পরে ধীরে ধীরে বাংলার বস্ত্রশিল্প লোপ পেয়ে গেল, আসতে লাগল বিলাতী কাপড় এদেশেরই তুলায় তৈরী হয়ে। নীলের চাষ সুরু হল দেশ জুড়ে। নীলকর রক্তচোষাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এদেশের প্রজাসাধারণ। বাংলা শুষে কোম্পানির বেড়ে গেল লোভ· কাজেই সারা ভারত জুড়ে জাল ছড়াবার চেষ্টা অনবরতই চলতে লাগল। জ্ঞানহীন নিরেট মূর্খ ভারতবাসী—এ রক্তচোষার দিগ্বিজয়ে বাধা তো দিলেই না বরং নানাভাবে তার সুবিধাই করে দিতে লাগল। একটির পর একটি করে সারা ভারতের দেশগুলি কোম্পানির কুক্ষিগত হয়ে গেল।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ, প্রথম থেকেই বৃটিশের সাথে ভারতের সত্যিকারের রাজা-প্রজার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি,—প্রজার স্বার্থেই রাজার স্বার্থ, এ সত্য বৃটিশও কোনদিন স্বীকার করে নি, ভারতও কোনদিন উপলব্ধি করতে পারে নি। মুসলমানও একদিন এদেশ জয় করেছিল, কিন্তু তারা এদেশকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিল। কাজেই এদেশের স্বার্থের সঙ্গে মুসলমান বিজেতাদের স্বার্থ এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বৃটিশের বেলায় তা হতে পারে নি। বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে তারা এসেছিল এদেশ শোষণ করতে—নানা ভাবে শোষণই তারা করে গেছে চিরকাল। তাদের সঙ্গে ভারতের ছিল শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক। এই শোষণের জন্যই ছিল তাদের শাসন;

শোষণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তাদের আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা সব-কিছু শাসনের যন্ত্র।

বাংলার মাটিতেই এই শোষণের শিকড় গেড়েছিল প্রথমে। কাজেই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষও প্রথম প্রকাশ পায় এই বাংলা দেশেই। প্রজার ভালমন্দ দেখা, তার মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যে শাসকেব কর্ত্তব্য, এ সত্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়। তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশের পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করতেন; কারণ তিনি জানতেন ইংরেজি শিক্ষা পেলেই ভারতবাসীর কুনো স্বভাব দুর হবে, সে বিরাট বিশ্বের দিকে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। এ সময় (১৮১৮) থেকে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে এবং রামমোহনও এর ভিতর দিয়ে তাঁর নবচেতনাব বাণী প্রচার করতে থাকেন। বাংলা 'সম্বাদকৌমুদী' ও ফার্সী 'মিরাৎ-উল্ আখবার' নামক পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মতামত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করতে লাগলেন।

কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর দেশীয় সংবাদপত্রের এত স্বাধীনতা বরদাস্ত কবতে পারলেন না। সরকার এক কড়া প্রেস আইন জারি করলে সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে (১৮২৩, ৪ঠা এপ্রিল)। রাজা রামমোহন রায় ঐ রকম আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র চালাতে রাজী হলেন না। আইন হবার দিনই রামমোহন তেজোদৃপ্ত ভাষায় এর প্রতিবাদ কবে সংবাদপত্র বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালেন খুব জোরে!

এ সময়ে এক আইন হয়েছিল: খৃষ্টান জুরিরা হিন্দু-মুসলমানদের বিচারে নিয়োজিত হতে পারবে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান জুরিরা খৃষ্টানদের বেলায় তা পারবে না। রামমোহন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'এমন সময় আসবে যখন হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে এমন সব অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে

তুমুল আন্দোলন তুলে লড়বে এবং তাতে তারা জয়ী হবে। ভারত তার বিরাট জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে যেমন বৃটিশের সহায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, তেমনি আবার ভীষণ শত্রু হয়ে বৃটিশের প্রভূত ক্ষতিও করতে পারে।'

রামমোহন রায় যে নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তন করেন, ইংরেজি শিক্ষার ফলে সে ভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এজন্যই অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ এর ফলাফল সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। একজন রাজপুরুষ একশ বছরেরও আগে (১৮৩১ খৃঃ) ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টরী কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ইংরেজি শিক্ষায় একদিন ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগবে, আর সেদিন আমাদের ভারত ছাড়তে হবে ; তারা নিশ্চয় একদিন প্রত্যেক ইংরেজকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে ইতস্ততঃ করবে না।' এই দুরদর্শী ইংরেজের কথা সত্যই আজ সফল হয়েছে!

১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনা ও আন্দোলনের জন্য কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এদেশে স্থাপিত হয় নি ; যা হয়েছে তা শুধু কোন নির্দ্দিষ্ট আইন বা শাসন-বিধি সম্পর্কে প্রতিবাদ সভা এবং তা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনবার জন্য আবেদন। ঐ বৎসর শেষের দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মিলে 'বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা সভা' নামে' এক সংঘ স্থাপন করেন। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল, 'যে-সব রাজকার্য্যাদির সাথে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তারই আলোচনা ও বিবেচনা।' কিন্তু এ-সভা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

এর পর-বছর স্থাপিত হল 'ভূম্যধিকারী সভা'। যদিও প্রধানতঃ জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জমিদারদের নিয়েই এ সভা স্থাপিত হয়েছিল, তবু ভূমিতে স্বত্ব আছে এরূপ সকল শ্রেণীর লোকই এর সভ্য হতে পারতেন। হিন্দু মুসলমান ইংরেজ সকলেই এই সভার সভ্য ছিলেন এবং এখানে আইন, পুলিশ, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আলোচনা হত।

১৮৩৮ সালে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' নামে এক সভা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর স্থায়ী সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়। এর অধিবেশন হত হিন্দু কলেজ ভবনে। প্যারীচাঁদ মিত্র এ-সভার সম্পাদক ছিলেন। এ সভায় সাহিত্য, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দেওয়া হত। একবার এক মজার ব্যাপার হল এই সভায়। এই সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোম্পানির ফৌজদারি আদালত ও পুলিশের অব্যবস্থা সম্বন্ধে এক কড়া বক্তৃতা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন নিমন্ত্রিত হয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা হয়েছিল কলেজেই। কোম্পানির কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনা শুনে রিচার্ডসন ক্ষেপে গিয়ে বল্লেন, কলেজকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানা করতে দিবেন না। অমনি সভাপতি তারাচাঁদ কঠোর ভাবে বললেন, রিচার্ডসন এখন কলেজের অধ্যক্ষ নন্, সভার নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র ; কাজেই তাঁকে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করতেই হবে। সভার সকলেই সভাপতিকে সমর্থন করেন। অগত্যা, রিচার্ডসন তাঁর কথা প্রত্যাহার কবতে বাধ্য হন। কিন্তু এ নিয়ে ইংরেজদের পত্রিকাগুলি খুব কয়েকদিন হৈ-চৈ করে শেষে চুপ মেরে যায়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ টমসন ও হ্যারী নামক দু'জন ইংরেজের উদ্যোগে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠিত হল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা এই সভায় যোগ দেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মঙ্গল এবং তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা। অবশ্যই আইন-সঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের কু-শাসনের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের কল্পনাও কেউ করতে পারতেন না তখন। তবুও এই প্রতিষ্ঠানটিই ভারতে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় রাষ্ট্রসভা বলে গণ্য হতে পারে।

এই সভার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে সকল সভা ছিল, সেগুলি

একটি একটি করে এর সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু এ সোসাইটি বেশি দিন স্থায়ী হল না।

তখনকার আইন ছিল. ইংরেজরা অপরাধ করলে তাদের বিচার হবে একমাত্র কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে। এ সময়ে ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকে নীলচাষ করতে গিয়ে এদেশে জমিদারী তালুকদারীও কিনে বসেছিল। তারা দেশের দূর-দুরান্তে থেকে কালা আদমিদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাত; কারণ, তাদের বিচার ঐ এক সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া আর কোন বিচারালয়েই হতে পারত না। তখন বড়লাটের আইন-সচিব ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব)। তিনি এসব বেসকারী ইংরেজদের উপদ্রব নিবারণের জন্য মফঃস্বলের যে কোন ফৌজদারী আদালতে এদের বিচারের জন্য এক আইন করবার প্রস্তাব করেন। শ্বেতাঙ্গ-সমাজ এই আইনের নাম দেয় 'কালো আইন' ( Black Act )। এ নিয়ে তখনকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজ এক বিষম হুলুস্থুল বাধিয়ে তুললে। প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গদের এ অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় গড়ে উঠল 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন' ১৮৫১-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর। এর দেড় মাস পরে ঐ একই উদ্দেশ্যে ২৯শে অক্টোবর স্থাপিত হল 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এরও সম্পাদক হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর সভাপতি হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। কলকাতার সকল বিশিষ্ট বাঙ্গালী এ সভায় যোগ দিয়ে একে শক্তিশালী করে তুললেন। এ থেকেই শ্বেতাঙ্গদের সাথে ভারতীয়দের ভেদ দৃঢ় হয়ে উঠল; কারণ এ সভায় কোন শ্বেতাঙ্গকেই নেওয়া হল না। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা। অবশ্যই ইংরেজদের কোলাহলে বেথুনের আইন আর হতে পারল না; কিন্তু এ সময় থেকেই বাঙ্গালীর মনে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্য সর্ব্বভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের কল্পনা জেগে উঠল এবং তার ফলে মাদ্রাজে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশনের একটি শাখা এবং বোম্বাইয়ে ঠিক অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠল প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই প্রচেষ্টায়। এই সভা অনেক বছর ধরে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ সরকারকে জানিয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে এর চেষ্টা ফলবতীও হয়েছে। বিশেষভাবে নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অপনোদনে এ সভা খুবই সাহায্য করেছে।

এর পরেই এলো ভারতের বিরাট স্বাধীনতা-সংগ্রাম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে—যে সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ইংরেজ ইতিহাসকারেরা নাম দিয়েছে সিপাহী-বিদ্রোহ। ভারত তখনও নব জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়নি, তবু ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণ এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য। নানা কারণে এ বিরাট অভ্যুত্থান বিফল হলেও, জনগণের মনে স্বাধীনতার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।

এদিকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাংলার নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠল। সিপাহী-বিদ্রোহের সুযোগে নীলকর সাহেবেরা অবাধভাবে নীলচাষী ও দেশীয় তালুকদারদের উপরে যত রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্ভব, তা-ই করতে লাগল। এ সময়ে তাদের অনেকে আবার এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে বসল। এতে তাদের অত্যাচার সহস্রগুণে বেড়ে গেল। ফলে বাংলার চারিদিকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে নীল চাষ করা ছেড়ে দিল। এই নীল-বিদ্রোহই বাংলার সর্ব্বপ্রথম গণ-আন্দোলন।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সে সময়ে মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি মেদিনীপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন করেন। এটি ছিল পূর্ণরূপে একটি স্বদেশী সভা—আলাপে ব্যবহারে রীতি-নীতিতে পুরোপুরী স্বদেশী। এই সভার সভ্যেরা কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত ইংরেজি

বর্জ্জন করতেন এবং কেউ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলে প্রতিটি শব্দের জন্য এক পয়সা জরিমানা দিতেন।

এর ছয় বছর পরে চৈত্রসংক্রান্তির দিন নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে চৈত্র বা হিন্দু মেলা স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের পূর্ব্ব যুগে ইহাই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সম্মেলন। মেলার উদ্দেশ্যের একাংশে বলা হয়েছিল, 'আমাদের এই মিলন কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য —ইহা ভারতভুমির জন্য। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মেলার নিয়মিত অধিবেশন হয়েছিল এবং নানা দিকে বাংলার জাতীয় জীবনকে তা উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

১৮৭৫ সালে শিশিরকুমার ঘোষের নায়কত্বে মধ্যবিত্ত লোকদের নিয়ে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। কিন্তু অচিরেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি নেতাগণ লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতসভা স্থাপন করেন (১৮৭৬)। এই সভার একজন প্রধান কর্ম্মী ও উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সভা নিখিল ভারতীয় আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই লীগ উঠে যায়। এই সময়েই আনন্দমোহন বসু 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' স্থাপন করে বাংলায় সর্ব্বপ্রথম ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ অগ্রবর্ত্তী হয়ে ভারত সভার আনুকূল্যে সর্ব্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনাকে রূপ দেবার জন্য সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন ( ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স ) আহ্বান করেন। ইহাই প্রথম সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রিক সম্মেলন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। আনন্দমোহন বসু তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় মন্তব্য করেন, "এই সম্মেলন হল ভাবী ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট বা জাতীয় পরিষদের প্রথম স্তর।"

এই জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের যুগেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর গ্রন্থাবলির

ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করেন। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের প্রতি স্তরে এই জাতীয় চেতনার সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ এই জাতীয় চেতনার মূলে রস-সঞ্চার করে একে দৃঢ় করেন।

এর পরেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। তার প্রতিষ্ঠা এবং কার্য্যকলাপের পেছনে রয়েছে ভারতের মুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। কংগ্রেসের ইতিহাস—ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ও জাতীয় মুক্তির দীর্ঘ ইতিহাস। পরের প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী তোমরা পাবে।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। ভারত আজ তার অভীষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভ এক কথা, লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করা তার চেয়েও বড় কথা। ভারতের নবযুগের অধিবাসী তোমরা—তোমাদের উপরে পড়েছে সেই ভার। সংযম, শৃঙ্খলা ও চরিত্রে মহীয়ান হয়ে তোমরা স্বাধীন ভারতকে গৌরবের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত কর, এই কামনাই আজ করছি।

জয় হিন্দ্

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায়

১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে বলি দেওয়া হয়েছিলো ভারতের স্বাধীনতাকে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে ভারতবাসীকে ভবিষ্যৎ জীবনে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছদ্মবেশে ইংরেজরা এদেশে প্রবেশ করেছিলো। পলাশীর প্রান্তরে ভারতবাসীরই বিশ্বাসঘাতকার সুযোগ নিয়ে ভারতবাসীর হাতে তারা পরালো পরাধীনতার শৃঙ্খল। ভারতবাসীর নিজের বল্‌তে যা কিছু, ভারতের শিক্ষা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের শিল্প, ভারতের কৃষি, সব-কিছুরই উপর চললো ইংরেজের অবিরত আক্রমণ। ইংরেজের টাকায় বহু কারখানা তৈরী হলো ভারতবর্ষে ভারতীয়দের ধনেপ্রাণে মারবার জন্যে; সে সব কারখানায় খাটবার জন্যে ভারতের লোকই দরকার ইংরেজের খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে। তাই শান্তিকামী চাষীদের জোর করে খাটতে বাধ্য করা হলো কারখানায়;—আপত্তি যারা করেছিলো তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হলো, তাদের উপর হলো নির্ম্মম অত্যাচার। প্রতিবাদ করবে এসবের?—অসম্ভব। ইংরেজ-আইনের শৃঙ্খল যে চেপে বসে আছে, প্রতিবাদ করবার কণ্ঠ তো ভারতবাসীর নেই!

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—One cannot charm all people for all time—সব মানুষকে চিরকালের জন্যে ভুলিয়ে রাখা যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। ইংরেজ নিজেই খুঁড়েছিলো তার নিজেব কবর। প্রথমে ভাবতের শিক্ষিত লোকেরা সব রকমে ইংরেজের অনুকরণ করাকেই সভ্য হওয়া বলে মনে করতেন! কিন্তু শিক্ষিতদের উপরেও ইংরেজরা নানা রকম অবিচার করতে আরম্ভ করলো। ওদিকে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইংরেজের কূটচক্রান্ত, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজের মনের কথা, এ সবই জানতে পারলেন শিক্ষিত ভারতীয়েরা। ১৮৫৭ সালে সিপাহীরা যুদ্ধ ঘোষণা করলো ইংরেজের বিরুদ্ধে। যদিও তাবা হেরে গিয়েছিলো ইংরেজের কাছে, তবু ভারতবর্ষে এর ফলে ইংরেজবিদ্বেষ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। সেই থেকে সুরু হলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের তীব্র আন্দোলন। সে আন্দোলনের স্বরূপ ও ধারা তোমরা আগেকার প্রবন্ধেই অনেকটা জেনে নিয়েছ।

কংগ্রেস সৃষ্টি হবার আগে সে আন্দোলন চলছিলো বিক্ষিপ্তভাবে—একটু এখানে একটু সেখানে। এই খণ্ড খণ্ড আন্দোলনকে একসূত্রে গাঁথলেন দেশগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সুরেন্দ্রনাথই ভারতের বিক্ষিপ্ত জাতীয় আন্দোলনকে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের ওপর নানা অবিচার করা হতো। প্রথমে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই আন্দোলন সুরু করেন, কিন্তু সেইটাই ক্রমে সর্ব্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের রূপ পায়।

ভারতবর্ষের লোকদের সুখ-সুবিধা দেখবার জন্যে এবং ভারতের সামাজিক উন্নতি-বিধানের জন্যে একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন নেতারা। তাই প্রধানত দেশগুরু সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে আর সকলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন"

বা ভারতসভা ; এরই উদ্যোগে একটি কন্‌ফারেন্স বসতো। ১৮৮৫ সালের ২৫এ ডিসেম্বর বোম্বাইএ অধিবেশন বসবার কথা। অধিবেশন বসবার মাত্র কয়েকদিন আগে এর নাম বদ্‌লে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" করা হলো। আমরা শুনে অবাক হই, এই কংগ্রেস গড়বার জন্যে প্রধান এক উৎসাহী ছিলেন একজন ইংরেজ অফিসার—এলান অক্টাভিয়ান হিউম তাঁর নাম। ভারতবর্ষের যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাবার জন্যে তিনি যা ত্যাগ করেছেন তা অতুলনীয়। ব্রিটিশের পুরোদস্তুর গোলাম হয়ে থাকতে পারলে তাঁর চাকরীর প্রচুর উন্নতি হতো—একটা প্রদেশের লাটসাহেব হবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁর ছিলো। ভারতবর্ষকে ভালোবাসবার অপরাধে তাঁর চাকরীর উন্নতির সব সম্ভাবনা নষ্ট হলো। তবু তিনি তাঁর আদর্শ ছাড়লেন না। সে-সময়কার বড়লাট লর্ড ডাফরিনকে তিনি বোঝালেন যে, ভারতীয়দের এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার সুযোগ দেওয়া উচিত, যেখানে তারা নিজেদের অভিযোগ সম্বন্ধে, এমন কি ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধেও আলোচনা করতে পারবে। শুনলে আরো বিস্মিত হবে, ব্রিটিশের গোলাম লর্ড ডাফরিন সরকার-বিরোধী এই কংগ্রেস গড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস-গঠনে তার উৎসাহ খুব কম ছিল না। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, এই ভাবে অসন্তুষ্ট ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু একথা তিনি তখন বুঝতে পারেননি যে, যে কবর তিনি খুঁড়লেন ভারতবর্ষের জন্য, সেই কবরেই ব্রিটিশের ভবিষ্যৎকে গোর দেওয়া হবে একদিন।

কংগ্রেস জন্ম নিলো ১৮৮৫ সালে। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে। ভারতের ইংরেজ-শাসনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করবার দাবীতে কতকগুলো প্রস্তাব নেওয়া হলো। একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে স্থির হলো যে, কংগ্রেস

যাই করুক না কেন, সেটা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে করবে এবং যতদূর সম্ভব ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে ভাব রেখে করবে। অর্থাৎ, ইংরেজের অধীনে থেকে ভারতের উন্নতি করা—এইটেই ছিলো তখন কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য।

দেশের শিক্ষিতেরা এবং ক্রমে অশিক্ষিতেরাও কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো। পরের বছর ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হলো কলকাতায়—চারশ' প্রতিনিধি নিয়ে। তার পরের বার হলো মাদ্রাজে—ছয়শ' প্রতিনিধি যোগ দিলো। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধিবেশনে আলোচিত হলো ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কথা। কংগ্রেস দাবী করলো, ভারতবর্ষ থেকে উপযুক্ত লোক নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের শাসনসভা তৈরী হওয়া উচিত এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজেরা যে প্রচুর টাকা লাভ করে নেয়, সেটা বন্ধ করে ভারতবর্ষের সুখ-সুবিধার দিকে ইংরেজের দেখা উচিত। তৃতীয় অধিবেশনে আরও স্থির হলো—দশ হাজারের বেশী লোক যে-সব সহরে আছে, সেখানে কংগ্রেসের কথা প্রচার করার জন্য একটি কমিটি তৈরী করতে হবে।

প্রচারের ফলে কংগ্রেসের সমর্থক বেড়ে যেতে লাগলো হু হু করে। এতদিনে ইংরেজ-সরকারের হুঁস হলো। তারা বুঝতে পারলো যে, কংগ্রেসের ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষের লোক সংঘবদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং এতদিন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে সাহায্য করছিলো, তা বন্ধ হলো অবিলম্বে। ইংরেজের চেষ্টা চলতে লাগলো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। একদা যে লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসের সহায়তা করেছিলেন, তিনিই এর বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ভাবে লাগলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ নিয়ে এসে তিনি ভারতের জাতীয়তার মূলে আঘাত করলেন। সে আঘাতের ক্ষত ক্রমশই বেড়ে উঠেছে—সে ঘায়ে যে পচন ধরেছে, সেটা আমরা বুঝলাম হিন্দু-মুসলমানের বীভৎস দাঙ্গায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজের চক্রান্ত—মুক্তিকামী ভারত এতে দমে নি, দগ্‌দগে ঘা নিয়েই সে এগিয়ে গেছে তার জাতীয় আন্দোলনে।

বৎসর বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে চললো। সাধ্য কি ইংরেজের তার গতি রোধবার? সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সৈন্যবিভাগে উন্নতি করবার, মদ উঠিয়ে দেবার, শ্রমিক-কৃষকদের সুখ-সুবিধার দিকে তাকাবার, লবণ-কর বন্ধ করবার, শিক্ষা-বিস্তার করবার, পশুর প্রতি যত্ন নেবার, বন-কর তুলে দেবার। দেশের লোক ক্রমেই বুঝলো, কংগ্রেসই বলছে তাদের প্রাণের কথা, কংগ্রেসই দেখছে তাদের সুখ-সুবিধা, দুঃখ-দুর্দশা। এ সময়কার কংগ্রেসের নামকরা নেতা ছিলেন—দাদাভাই নৌরজী, দেশগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বদরুদ্দীন তায়েবজী, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী ভারতবন্ধু মিঃ জর্জ ইউল, মিঃ হিউম, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লোকমান্য তিলক, পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ইত্যাদি।

১৮৯৬ সালে দুর্ভিক্ষ নিবারণে, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে দুর্গতদের সহায়তায় এবং সেই সালেই ভীষণ প্লেগের আক্রমণ নিবারণে কংগ্রেস বিশেষভাবে সাহায্য করলো দেশবাসীকে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের নাম এর পর অদ্ভুতভাবে বেড়ে গেলো।

এইভাবে আন্দোলন চললো এগার বছর। ১৮৯৭ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হলো, তাতে নূতন চেতনা জাগালেন লোকমান্য তিলকের বন্ধু কংগ্রেস-নেতা গণেশশ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে। তিনি বললেন—ভারত যা পেয়েছে, তাই নিয়ে খুসী না থেকে তার চাওয়াটাকে আরও বড়ো করতে হবে—না হলে পৃথিবীর উন্নতজাতিগুলির মধ্যে ভারত স্থান পাবে না। শিক্ষিত জনসাধারণের উপর ব্রিটিশ ইতিপূর্বেই নানাভাবে নিপীড়ন সুরু করেছিলে। গণেশশ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতায় শিক্ষিতেরা আরও উত্তেজিত হলেন।

১৯০০ সালে লাহোরে কংগ্রেস-অধিবেশনে লালা লাজপত রায় দুটি গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব আনেন। 'গঠনমূলক কাজ' হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলার কাজ। এই দুটি কাজ হলো—শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পবিস্তার।

এইবারেই কংগ্রেস প্রথম গঠনমূলক কাজ নিলো। ১৯০১ সালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত রইলেন।

'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে।' এর পর ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের অকথ্য উৎপীড়নে বিপ্লবী ভারতের জন্ম হলো। সব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, ভারতীয়দের উপর অবিচার করাই ছিলো লর্ড কার্জনের নীতি। ১৯০২ সালের কংগ্রেস-অধিবেশনে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালের কংগ্রেসেব অধিবেশনেও লর্ড কার্জনের উৎপীড়নের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়।

বাধা যেখানে বেশী, কাজের গতি সেখানে বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালে বাংলার অসাধারণ আন্দোলনের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ এনে দেবার জন্যে, বড়লাট লর্ড কার্জন বিলাতে ফিরে যাবার আগে বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে যান। কিন্তু ব্যর্থ হলো এই চক্রান্তও। বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে বাংলা-দেশের নেতারা আরম্ভ করলেন বিপুল আন্দোলন। তাঁরা সবাই বারণ করলেন বিদেশী জিনিস কিনতে। বিলাতী জিনিষ যারা বিক্রী করে, তাদের দোকান বয়কট করা হলো। গ্রামে গ্রামে পোড়ান হলো বিলাতী কাপড়, ফেলে দেওয়া হলো স্তূপাকৃতি বিলাতী জিনিষ, মেয়েরা ভেঙে ফেললেন রাশি রাশি বিলাতী কাঁচের চুড়ি। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলো, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ ভাগ করার ব্যবস্থা শেষ হবে। অমনি বাংলার কংগ্রেস নেতারা স্থির করলেন, এই দিনটিতেই তাঁরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে সব রকম ভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। দিকে দিকে রব উঠলো—'বন্দে মাতরম্'। 'বন্দে মাতরম্' বলার জন্যে কত লোকের মাথায় পড়লো পুলিশের লাঠি, কত লোক হলো গ্রেপ্তার! সেদিন এই 'বন্দে মাতরম্'এর ভিতর দিয়েই ভারতবর্ষের জনগণ শুনেছিলো মুক্তির মন্ত্র, আর ইংরেজ শুনেছিলো তার মৃত্যুর আর্তনাদ!

বাঙালীই সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখিয়েছিলো মুক্তির পথ, দেখিয়েছিলো—ভিক্ষার দ্বারা মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে—আন্দোলনেই শিকল ছেঁড়ে, আবেদনে নয়! তাই বাংলাদেশে স্থাপিত হলো স্বদেশী কারখানা, স্বদেশী দোকান। সরকারী ইস্কুল বর্জন করে স্থাপিত হলো "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ" (National Council of Education)। জাতীয় আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বিতীয়া শিষ্যা 'ভগিনী' নিবেদিতা ইত্যাদি মনীষীদের চেষ্টায় ও উৎসাহে।

ব্রিটিশের অত্যাচার যতই বেড়ে যেতে লাগলো ভারতের ওপর, যে কোনো ন্যায্য আন্দোলনের উপরেই যখন সুরু হলো অকথ্য উৎপীড়ন, ততই কংগ্রেসের ভেতর একদল লোক কংগ্রেসের সে সময়কার ইংরেজভজা নীতির বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠতে লাগলেন। ক্রমে এর থেকেই দুটো দল দাঁড়িয়ে গেলো—ইংরেজের সঙ্গে যাঁরা ভাব রেখে কাজ করতে চান, তাঁদের দলের নাম হলো নরমপন্থী বা Moderate, আর ইংরেজকে পরোয়া না করে যাঁরা আন্দোলন চালাতে ইচ্ছে করলেন, তাঁদের দলের নাম হলো চরমপন্থী বা Extremist। ফিরোজ শাহ্ মেটা, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরজী এরা ছিলেন নরমপন্থী দলে। আর চরমপন্থী দলে প্রাধান্য ছিলো লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পালের—তাই চরমপন্থী দল 'লাল বাল-পাল'এর দল বলেও বিখ্যাত ছিলো। দুই দলে বিরোধ এতদূর বেড়ে ওঠে যে, অনেক বছর ধরে চরমপন্থী দল বা নূতনতাবাদী দল কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের পর থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালীর, মন বিষিয়ে ওঠে। সেই বিশেষ প্রতিক্রিয়া পূর্ণ হলো সেদিন, যেদিন ইংরেজ বিচারপতি কিংসফোর্ড দেশ-

প্রেমিক সুশীল সেনকে প্রকাশ্য আদালতে পনর ঘা বেত মারবার আদেশ দেন। এর পর ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের চেষ্টা করে ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী নামে দুটি কিশোর। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হলো, প্রফুল্ল চাকী করলো আত্মহত্যা। তার পরের কয়েক বছর ধরে সমস্ত ভারতে চললো ইংরেজ-হত্যা, ইংরেজদের দালাল-হত্যা, এবং স্বদেশের কাজের জন্যে ডাকাতি। সেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন ভট্টাচার্য (এখন মানবেন্দ্র রায় নামে বিখ্যাত), বিপিন গাঙ্গুলী, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি বিপ্লবীগণ।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের আন্দোলনের ইতিহাস হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবী আন্দোলন এবং স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীর উপর ইংরেজের অবর্ণনীয় অত্যাচারের ইতিহাস। সুখের বিষয়, ওদিকে তখন চরমপন্থী-নরমপন্থী দুই দলের ঝগড়া কমে এসেছে, কারণ প্রায় সবাই তখন চরমপন্থীর দলে—সবাই চায় ব্রিটিশের সমান অধিকার। কংগ্রেসের আদর্শ তখন স্বায়ত্তশাসন—অর্থাৎ ব্রিটিশের সঙ্গে খানিকটা যোগ রেখে নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করবো। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হলো —স্বায়ত্তশাসন চাই। কিন্তু কংগ্রেসকে চালাবার জন্যে তখন উপযুক্ত নেতা নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট পথ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার। এই সময় অন্ধকারে আলো হাতে করে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। অবশ্য এর আগেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব আরম্ভ হলো ১৯১৯ সালে 'রাউলাট' আইনকে কেন্দ্র করে। এই আইনে বলা হয়েছিলো, 'পুলিশ সন্দেহ করলেই ভারতের যে-কোন লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবে, ভারতীয়কে খুসীমত নির্বাসন অথবা যে কোনও শাস্তি দিতে পারা যাবে।' এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করলেন ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল। সমগ্র ভারত এতে অদ্ভুতভাবে সাড়া দিলো। পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশ খুব অত্যাচার

করলো। তার প্রতিবাদ করবার জন্যে পাঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগ নামক জায়গায় কমপক্ষে দশ হাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ সভা করে। ইংরেজ-সেনাপতি জেনারেল ডায়ারের আদেশে সৈন্যেরা মেসিনগানের গুলি চালালো শান্ত জনতার ওপর—এক হাজার নরনারী নিহত হলো, আহত হলো প্রায় আড়াই হাজার। এর পরই পাঞ্জাবে সামরিক আইনের বলে পুলিশ নির্মম অত্যাচার চালালো। নেতাদের নির্বাসন দেওয়া হলো, বিনাবিচারে বহু ছাত্র ও শিক্ষককে জেলে দেওয়া হলো, একটা রাস্তায় লোকজনকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা হলো, বহু নিরীহ দেশপ্রেমিককে সকলের সামনে খোলা জায়গায় বেত মারা হলো, পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেদের দিয়ে ব্রিটিশের পতাকা অভিবাদন করানো হলো, হাতে শিকল আর কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো বহু লোককে। এসব হচ্ছে ভারতবাসীদের উপর ব্রিটিশের নির্মম নিপীড়নের কয়েকটিমাত্র নমুনা। স্বাধীন ভারতের নরনারী হিসাবে আমাদের জেনে রাখা উচিত—পরাধীনতার এই সব জ্বালার ইতিহাস। জেনে রাখা উচিত—কত লোকের কতখানি আত্মত্যাগে আজকের স্বাধীন ভারতের স্বর্ণসৌধ নির্মিত হয়েছে।

এর পরের যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে গান্ধী-যুগ—যখন থেকে গান্ধীজী গ্রহণ করলেন চরমপন্থীদলের নেতৃত্ব। ১৯২০ সাল থেকে আরম্ভ হলো এই নতুন যুগ। ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত গেছে 'হোমরুল' বা স্বরাজের আন্দোলন—বিখ্যাত কংগ্রেসনেত্রী আনি বেসান্ত ও লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে। কিন্তু এতদিন ভারতের আন্দোলন যেন এক ছিলো না—ছাড়া ছাড়া ছিলো। মহাত্মা এলেন যেন ভগবানের দূত হিসাবে—জাতিকে পথ্ দেখাতে। গান্ধীজী কংগ্রেসকে দেখালেন বিপ্লবের নূতন পথ, সে হচ্ছে অহিংসার পথ। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের সর্বসম্মত নেতা হিসাবে ভারতবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানালেন বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অসহযোগ করতে—ব্রিটিশের কাজে এতটুকু সাহায্য

করতেও তিনি বারণ করলেন ভারতবাসীকে। কিন্তু এই অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর যেন হিংসার ভাব না আসে, তার জন্য তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন—'হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, অহিংসা তেমনি মানুষের ধর্ম। ভারতবর্ষ দুর্বল বলে আমি তাকে অহিংসানীতি গ্রহণ করতে বলছি না। ভারতের শক্তি-সামর্থ্যের কথা জেনেই আমি তাকে অহিংসানীতি গ্রহণ করতে বলছি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জানুক—তার আত্মা অমর, দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সে চিরজয়ী।' অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো। ভারতের জনগণ একে অদ্ভুতভাবে সাফল্যময় করে তুলতে লাগলো। ছাত্ররা গভর্ণমেণ্টের ইস্কুল ছাড়লো, গভর্ণমেণ্ট-অফিসের বহু লোক চাকরী ছাড়লো, শাসন-পরিষদের ভারতীয় সভ্যেরা পরিষদ ত্যাগ করে চলে এলেন। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনগণকে তিনটি গঠনমূলক কাজ দিলেন—প্রধানত চরকা চালানো, হিন্দু-মুসলমানের একতা সাধন এবং অস্পৃশ্যতা বর্জন। তাঁর কাজে সাহায্য করলেন মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী দুই ভাই। গান্ধীজী সমস্ত ভারতের স্বরাজের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন—সংগ্রহ করলেন এক কোটির ওপর টাকা, প্রবর্তন করলেন জনসাধারণ সবাইএর কংগ্রেসের সভ্য হবার নিয়ম, কংগ্রেস থেকে বিলি করা হলো ২০ লক্ষের উপর চরকা। অসহযোগ-আন্দোলনের ফলে ৩০ হাজারেরও বেশী দেশসেবী গ্রেপ্তার হলো।

আন্দোলনের ভেতর হিংসার ভাব ঢুকে যাওয়ায় মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ করলেন ১৯২২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। এর পর ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করলেন, কংগ্রেসসেবীদের উচিত ব্রিটিশের সঙ্গে আইনত সহযোগিতা করে শাসন-পরিষদে ঢুকে ব্রিটিশের কাজের ক্ষতি করা। মহাত্মা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে এ মত সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের ভেতর এই উদ্দেশ্যে 'স্বরাজ্য দল' নামে নূতন দল গড়লেন চিত্তরঞ্জন। বাংলাদেশে, মধ্যপ্রদেশে এবং বেরারে স্বরাজ্যদল বিরাটভাবে

জিতে শাসন-পরিষদ দখল করলো। এদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিরাট-ভাবে এগিয়ে চললো 'স্বরাজের' জন্যে নির্দিষ্ট গঠনমূলক কাজগুলি।

১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস-অধিবেশনে বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল 'স্বরাজ' কথাটির অর্থ করলেন—'পূর্ণ স্বাধীনতা'। ১৯২৯ সালে কলকাতার অধিবেশনে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিলো যে, যদি ব্রিটিশের অন্যান্য উপনিবেশের মতো (যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি) ভারতবর্ষকেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডমিনিয়ন স্টেটাস দেবার ভিত্তিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শাসনের খসড়া তৈরী করতে প্রস্তুত হয়, কেবলমাত্র তখনই কংগ্রেস তাকে সমর্থন করবে। এর পর ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজী মাত্র ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ করলেন। লবণ তৈরী করবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতের লোকের লবণ তৈরী করবার অধিকার ছিলো না। মহাত্মাজী এই আইনকে অমান্য করে দণ্ডী নামক জায়গায় সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করলেন। লবণ জিনিস সামান্য হলেও, লবণ-সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ভারতবর্ষ আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনায়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসন টলছে দেখে বেগতিক ইংরেজ আপোষ-আলোচনার জন্যে 'গোলটেবিল বৈঠক' ডাকলেন বিলাতে। কিন্তু চক্রান্তকারী ব্রিটিশের কুটচক্র ভোলাতে পারলো না সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীকে এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের। আলোচনা বিফল হলো। আবার আন্দোলন সুরু হলো—আবার আরম্ভ হলো ব্রিটিশের নির্যাতন, কারাগার, নির্বাসন, ফাঁসি, দ্বীপান্তর। লবণ-সত্যাগ্রহের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলো নব্বই হাজার কংগ্রেসকর্মী—এবার গ্রেপ্তার হলো প্রায় দুই লক্ষ। এ যুগের বিখ্যাত নেতারা হলেন—বিজয়রাঘব আচারী, হাকিম আজমল খাঁ, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি কংগ্রেসনেতাগণ।

১৯৩৫ সালে 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' নামে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হলো। যদিও প্রদেশগুলির শাসনভার এতে কিছু পরিমাণ ভারতবাসীদের হাতে এলো, কিন্তু চতুর ব্রিটিশ এমনভাবেই এই শাসনতন্ত্র রচনা করেছিল, শাসন-পরিষদে ভারতবাসীকে যাতে বেশ মুস্কিলে পড়তে হয়—বিশেষ করে বিপ্লবের জন্মস্থান বাংলাদেশে। ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিলো।

গোল বাধলো ১৯৩৯ সালে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন পাবার আশায় তাতে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলো। এই সহযোগিতার বদলে যুদ্ধজয়ের পর বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ পুরস্কার দিয়েছিলো জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এবারকার যুদ্ধে কংগ্রেস সরাসরি বললো, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দাও, স্বাধীন দেশ হিসাবে তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু পরাধীন থেকে তোমাদের যুদ্ধে 'না দেবো এক পাই, না দেবো এক ভাই।' কংগ্রেসের এই কথা প্রচার করতে করতে এক-একজন করে নেতা সত্যাগ্রহ করেছিলেন বলে ১৯৪০ সালের এই আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে 'একক সত্যাগ্রহ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ইংলণ্ডের কূটনীতি-বিশারদ মিঃ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ১৯৪২ সালে আর এক শয়তানি খসড়া নিয়ে এলেন। ওদিকে কংগ্রেস থেকে অধিকাংশ মুসলমান গিয়ে মিঃ জিন্নার পরিচালিত 'মোসলেম লীগ'এ যোগ দিয়েছে। তারা নূতন দাবী উপস্থিত করেছে 'পাকিস্তানের'—মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের—ঐক্যবদ্ধ ভারত তারা চায় না। স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ও এই বিভেদের সুযোগ নিয়েই রচনা করেছিলেন তাঁর 'মেকী স্বাধীনতার' শাসনতন্ত্র। ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ কংগ্রেস এই ক্রীপ্‌স্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেস-অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ভারতকে যুদ্ধের মন্ত্র দিলেন—'Quit India'—ভারত ছাড়ো! নেতারা সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার হলেন। তারপর থেকেই সুরু হলো ভারতের নানাস্থানে বিপ্লবী আন্দোলন।

লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসী কর্মী এবং কংগ্রেসনেতা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু সেই আন্দোলনেই ব্রিটিশ ভয় পেয়ে গেলো দস্তুরমতো। ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হতে কংগ্রেসনেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগতেই, সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন ব্রিটিশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম চালাতে—অবশ্য অহিংসভাবে। কংগ্রেস সে কথা মেনে নেয় নি। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে জাপানের সহায়তায় ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়লেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো—যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে বলে ইংরেজ দুর্বল, এই সময় বাইরে থেকে আক্রমণ করলে ভারতের ভিতরেও নিশ্চয়ই বিপ্লব জেগে উঠবে, ইংরেজ পালাতে পথ পাবে না। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি দুর্ভাগ্যক্রমে, কিন্তু সেই উপলক্ষে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের শক্তি শত-গুণ বেড়ে গেলো।

ইংরেজ এর পর স্বাধীনতার আলোচনায় আসতে বাধ্য হলো। সিমলায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের প্রধান সব রাজনৈতিক দলের এক অধিবেশন বসালেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ধুয়ো তুলে তিনি অবশেষে সেই অধিবেশনকে ব্যর্থ বলে প্রচার করলেন।

এর পর বিলাতের পার্লামেণ্ট থেকে এলেন মন্ত্রীমিশন—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ ও মিঃ আলেকজাণ্ডার। ভারতবর্ষে এসে তাঁরা স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে।

কিন্তু আবার গণ্ডগোল বাধলো। ১৯৪০ সাল থেকে মোসলেম লীগ যে 'পাকিস্তানের' আন্দোলন চালাচ্ছিলো, ভারতের অধিকাংশ মুসলমান মোসলেম লীগে যোগ দেওয়ার ফলে, সে আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আগেই বলেছি, কংগ্রেসের নেতারা ছাড়া পেয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের শেষভাগে। ১৯৪৬ সালে শাসন-পরিষদের যে নির্বাচন হলো, মোসলেম লীগ পাকিস্তানের কথা মুখে নিয়ে বিপুলভাবে তাতে জিতে দখল

করলো ভারতের কয়েকটি প্রদেশের শাসন-পরিষদ। এর পর মোসলেম লীগ দাবী করলো, যে যে প্রদেশে মুসলমান বেশী, সেই প্রদেশগুলিকে নিয়ে আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠন করা হোক—পাকিস্তান। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব বিফল হলো। এর পরই ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট হিন্দু-মুসলমানের ভয়ংকর দাঙ্গা বাধলো সারা ভারত জুড়ে—পাকিস্তান-প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। কোন মীমাংসা না করতে পেরে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাতে চলে গেলেন।

নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে ঘোষণা করলেন সে ঘোষণা আনন্দেরও বটে, দুঃখেরও বটে। আনন্দের এই জন্যে যে, এই ঘোষণায় ছিলো ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার কথা। দুঃখের এই জন্যে যে, স্বাধীনতা ঘোষণা হলো অখণ্ড ভারতবর্ষের নয়—ভারতবর্ষ এই ঘোষণার দ্বারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো—'পাকিস্তান' আর 'ভারতীয় ইউনিয়নে'।

যার জন্যে ভারতবাসী বসেছিলো যুগ যুগ ধরে, প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী দস্যু ইংরেজের হাতে, নির্বিচারে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে ভারতের অগণিত নরনারী, সেই স্বাধীনতা এলো। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—'স্বাধীনতা না দেখে মরবো না'। তিনি বেঁচে থাকতেই স্বাধীনতা এলো—কিন্তু খণ্ডিত ভারত মহাত্মার হৃদয়কেও খণ্ডিত করলো। ম্লান হয়ে গেলো বিপ্লবী কংগ্রেসনেতাদের মুখ, ম্লান হলো ভারতের আশাবাদী নরনারীর মন। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা গান্ধীজী বললেন—হিন্দু আর মুসলমান ভিন্ন হয়ে থাকবে—এটা অসত্য, এবং যেহেতু অসত্য কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না, সুতরাং খণ্ডিত ভারতও স্থায়ী হবে না। কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে কাজ করলে অদূরভবিষ্যতে বিভক্ত ভারত আবার এক হয়ে যাবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আদর্শ গ্রহণ করেছিলো—কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠা। আমরা আশান্বিত নেত্রে চেয়ে আছি সেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের পানে—যা হবে কৃষক-মজদুর-প্রজার 'দ্বারা' প্রতিষ্ঠিত, কিষাণ-মজদুর-প্রজার 'জন্যে'

প্রতিষ্ঠিত, যা হবে সম্পূর্ণরূপে কিষাণ-মজদুর-প্রজারই রাষ্ট্র। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনা করবে সেই আদর্শ রাষ্ট্র। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' সম্বন্ধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কথা সেদিন সার্থক হয়ে উঠবে—"স্বরাজ আসবে সেদিন, যেদিন দূরান্তের গ্রামগুলি জনগণের জন্যে থাকবে প্রচুর খাদ্য, ভারতের অর্ধনগ্ন নরনারীর লজ্জা ঢাকবার জন্যে থাকবে প্রচুর বস্ত্র, আর রুগ্ন-শিশুর তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে প্রচুর দুধের যেদিন অভাব হবে না।"

বছর চল্লিশেক আগে একদিন বেলাশেষে এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ঢাকার এক প্রশস্ত রাজপথের ধার ঘেঁসে। পড়ন্ত রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে ভদ্রলোক ছাতা আগলে চলেছিলেন পূব থেকে পশ্চিম দিকে।

বেলা চারটে বেজে গেছে। আশপাশের স্কুল-কলেজগুলো সবে মাত্র ছুটি হয়েছে। চটুল চঞ্চল ছেলের দল চারদিক কলকোলাহলে মুখরিত করে চলেছে বাড়ীর পানে।

জাঁকালো পোষাক-পরা একজন ইংরেজ ঘোড়ায় চড়ে আস্তে আস্তে চলছিলেন সেই পথে। তাঁর পেছনে আরও দু'জন অশ্বারোহী ইংরেজ আসছিল পূর্ববর্তী সাহেবকে অনুসরণ করে!

ছাতা মাথায় ভদ্রলোককে যেতে দেখেই পেছনের অশ্বারোহী দু'জন ছুটে গেল ভদ্রলোকের কাছে, হাতের হাণ্টার দিয়ে কসে মারল ছাতার উপর

খা-কয়েক, সিংহ-গর্জনে হুকুম দিল—বন্ করো, ছাথি বন্ করো, লাটসাহেব যাতে—পছানৃতা নেই! সেলাম করো—জল্‌দি!

নিরীহ ভদ্রলোক জাত-সিংহের বাচ্চা দুটির আস্ফালন দেখে আর গর্জন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছাতা বন্ধ করলেন এবং ছাতাটা বগলচাপা করে সেলাম ঠুকে সরে পড়লেন!

এই দেখে দূর থেকে একদল ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—বন্দে মাতরম্। লাল কাপড় দেখলে জীববিশেষ যেমন লেজ উচিয়ে শিং বাগিয়ে ছোটে, সাহেব-পুঙ্গবেরাও তেমনি করে তেড়ে গেল ছেলেগুলোর দিকে। কিন্তু চপল কিশোর ওরা, ছুটে কোথায় মিলিয়ে গেল। তখন সাহেবদেরও বিপদ গেল বেড়ে, চারদিক থেকেই চীৎকার উঠছে—বন্দে মাতরম্। সাহেব দুটিও হাণ্টার তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে চরকির মত,—যাকে সামনে পাচ্ছে মারছে তাকে হাণ্টারের ঘা। এমন কি লাটসাহেবও ভুলে যাচ্ছেন নিজের পদমর্য্যাদা, মাঝে মাঝে তিনিও তাড়া দিচ্ছেন ছেলেদের।

ঢাকা সহরের বুকে সে দিনে এ রকম দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যেত। যে লাটসাহেব এসবের নায়ক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ব্যামফিল্ড ফুলার—নব-গঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের প্রথম ছোটলাট। ভারত-শাসনে বৃটিশরাজ হিন্দু-মুসলমানে যে বিভেদনীতি সূক্ষ্মভাবে অবলম্বন করেছিলেন সিপাই বিদ্রোহের পর থেকেই, তারই স্থূল প্রকাশ সুরু হয় এঁর সময় থেকে প্রচণ্ড ভাবে,—যার ফলে আজ সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে গেল।

লর্ড কার্জন ১৮৯৯এর জানুয়ারী থেকে ১৯০৫এর নবেম্বর পর্যন্ত একটানা সাত বছর ভারতের বড়লাট ছিলেন, মধ্যে ১৯০৪এর এপ্রিল থেকে নবেম্বর পর্যন্ত আট মাস মাত্র লর্ড এ্যাম্পথিল অস্থায়ীভাবে বড়লাটের কাজ করেছিলেন। কার্জনের মত জবরদস্ত বড়লাট ভারতে খুব কমই এসেছেন। তিনি ভারতবাসীদের অতি নীচশ্রেণীর জীব বলে মনে করতেন। জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ বঙ্গবাসীরা তাঁর চক্ষুশূল ছিল। বাঙ্গালীদের আত্মচেতনাকে তিনি

ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের চরম অমঙ্গলকর বলে মনে করতেন। তাই বাংলায়ই তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে বিরাট ব্যবধান ও বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কার্জন বাংলাদেশ থেকে ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগকে ভাগ করে আসামের সহিত যুক্ত করে দিয়ে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' নামে এক নূতন প্রদেশ গড়বার পরিকল্পনা করলেন। এর বিরুদ্ধে তখন প্রবল প্রতিবাদ সুরু হল। ১৯০৩ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসও এর প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর লর্ড কার্জনের পরিকল্পনাকে 'পাশবিক ব্যবস্থা' (Beastly arrangement) আখ্যা দিলেন।

বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র প্রতিবাদে লর্ড কার্জন যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী ও অসাধু বলে গাল দিলেন। দেশে ভয়ানক বিক্ষোভ দেখা দিল। লর্ড কার্জন এবার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

এর পর লর্ড কার্জন ঢাকা গেলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদমূলক এবং তা বন্ধ করবার অনুরোধমূলক বড় বড় প্রাচীরপত্রে তাঁর গন্তব্য পথের দুইধার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাস্তার দুই পাশের জনতা, বিশেষ করে ছাত্রসম্প্রদায় নানারূপ ধ্বনি করে বড়লাটকে বঙ্গভঙ্গ না করতে অনুরোধ জানাল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিরত হলেন না। ঢাকার এক সভায় তিনি মুসলমানদের বুঝিয়ে দিলেন, বঙ্গভঙ্গ করে তিনি একদিকে যেমন বাংলার ছোটলাটের কার্যভার কতকটা লাঘব করতে চান, তেমনি অপরদিকে তিনি একটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশ গঠন করে মুসলমানদের রাজনীতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। লর্ড কার্জনের এই কথায় অনেক মুসলমান বঙ্গভঙ্গের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এমন কি, যে নবাব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনিও এর একজন পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। মিঃ গুরুমুখ নিহাল সিং তাঁর

একখানি পুস্তকে লিখেছেন, নবাব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুরকে খুব কম সুদে একলক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়ে বঙ্গভঙ্গে তাঁর সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, নবাব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুরের ভাই খাজা আতিকুল্লাহ্ বাহাদুর, মিঃ এ রসুল প্রমুখ মুসলমান প্রধানগণের এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলা ভাগ হয়ে গেল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে।

বাঙ্গালী ছিল তখন শিক্ষাদীক্ষায় ও রাজনীতিক চেতনায় ভারতের নেতৃস্থানীয়। লর্ড কার্জন চেয়েছিলেন, বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে ভারতের প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেবেন। কিন্তু ফল হল তার বিপরীত। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হল, ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পরে এরূপ বিপ্লব আর দেখা যায় নি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ দ্বারা লর্ড কার্জনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ-সৃষ্টি—তা যে সফল হয়েছে, আজকের পাকিস্তানরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ !

বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন সুরু হল, তা-ই স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত। প্রথমভাগে এ আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গের কথা শুনে সমস্ত বাঙ্গালী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এর প্রতিকার করবার জন্য সকলেই অধীর হল। কিন্তু পরাধীন জাতি কি ভাবে এর প্রতিকার করবে ? সে যুগের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি উপায় বলে দিলেন—স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন। 'সঞ্জীবনী'র এই বাণী বাংলার দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হল। সর্বত্র সভাসমিতি করে বাংলার জনগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এবং বিলাতী-বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করল। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গানে বিলাতীবর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণের কথা প্রচারিত হতে লাগল। সে যুগে যারা স্বদেশীর অগ্নিমন্ত্র প্রচার করে সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত

সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি প্রাতঃ-স্মরণীয় ব্যক্তিগণ। হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পৃথক করবার চেষ্টা করা হলেও বহু বিশিষ্ট মুসলিম-নেতা এই বিরাট আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—খাজা আতিকুল্লাহ্ বাহাদুর, ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, মৌলভী আবদুল গফুর সিদ্দিকি, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি মুসলিম নায়কগণ। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এঁদের নাম অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

১৬ই অক্টোবর, বাংলা ৩০শে আশ্বিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গভঙ্গ হবে বলে সরকার ঘোষণা করল। এই দিনটি বাঙ্গালীর নিকট চরম দুর্ভাগ্যের দিন বলে গণ্য হল। বাংলার সর্ব্বত্র সেদিন 'রাখীবন্দন' ও 'অরন্ধন'ব্রত পালিত হল। বাঙ্গালীরা আনন্দমোহন বসুর স্বাক্ষরিত সংকল্প গ্রহণ করল—"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ করেছে, সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও আমাদের প্রদেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করব। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।"

দেখতে দেখতে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় সারা বাংলা প্লাবিত হয়ে গেল। স্বদেশীর নবীন ভাবধারা প্রচার করতে লাগল ইংরাজীতে অমৃত-বাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী এবং বাংলায় সঞ্জীবনী, হিতবাদী, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার নবশক্তি এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা পত্রিকা। আর এই নব ভাবধারার প্রধানতম ধারক ও বাহক হল বাংলার কিশোর। এদের সংঘবদ্ধ শক্তিতে স্বদেশী আন্দোলন সফল হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসকদের টনক নড়ল।

ছাত্রগণ যাতে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দিতে পারে, তার জন্যে ভারত সরকার থেকে বিজলী সার্কুলার প্রচারিত হল। বাংলাদেশে বের

হল কার্লাইল সার্কুলার। এতে বলা হল—ছাত্রদের রাজনৈতিক ব্যাপারে নিয়োজিত করে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং তাদের স্বার্থনষ্ট করা হচ্ছে। কাজেই কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে বা স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জ্জন প্রভৃতি অপকার্য্যে যোগ দিতে দিবেন না। এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় দিলে বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পাবে না। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজেরা শাসন করতে না পারলে অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ছাত্রদের নামের তালিকা পাঠাবেন।

এইরূপে ছাত্রদের হুমকি দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করবার আয়োজন হল। কিন্তু জাগ্রত ছাত্রসমাজকে চোখ রাঙিয়ে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভবপর হল না। ফলে সুরু হল সারা দেশজোড়া মর্ম্মান্তিক ভাবে ছাত্রদলন।

মাদারীপুরে মিঃ ক্যাটেল নামক একজন পাটুয়া সাহেব রাস্তায় যেতে যেতে একটি ছেলেকে ছাতা মাথায় দেখতে পায়। সাহেবকে দেখেও ছেলেটির ছাতা খুলে রাখার ধৃষ্টতা সাহেবের অসহ্য হয়। সে ছেলেটিকে ধরে বেদম প্রহার করে। ডাক্তার রিপোর্ট দেয়, ছেলেটির জখম খুব গুরুতর। ক্যাটেলের নামে নালিশ হয়। ফরিদপুরের সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন—ক্যাটেল নির্দ্দোষ, ছেলেটাই ছাতা মাথায় দিয়ে ক্যাটেলকে উত্তেজিত করেছে।

এর পরেই ক্যাটেল কয়েকটি ছাত্রের নামে অভিযোগ করে যে, তারা তাকে পথে পেয়ে নিদারুণ উত্তম-মধ্যম দিয়েছে। স্কুলের ইনস্পেক্টার মিঃ ষ্টেপলটন্ তদন্ত করে আদেশ দেন, যে তিনটি ছেলে এ হাঙ্গামার নেতা, তাদের প্রত্যেককে স্কুলের হেডমাষ্টার মহকুমা হাকিমের কাছে পঁচিশ ঘা করে বেত মারবেন, অথবা তারা প্রত্যেকে দেড় শ' টাকা করে জরিমানা দিবে। নইলে ঐ স্কুলে সরকারী সাহায্য পাবে না। ঐ স্কুলে তখন হেডমাষ্টার ছিলেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি এই ঘৃণিত ও অপমানজনক দণ্ড দিতে কিছুতেই সম্মত হননি।

স্বদেশী সংকল্প গ্রহণের পর নানা স্থানে ছেলেরা উপবাসী থেকে খালি পায়ে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। এই অপরাধে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও বাংলার অন্যান্য বহু স্কুলের ছাত্রদের জরিমানা করা হয়। রংপুরের এক স্বদেশী সভায় ছাত্রগণ উপস্থিত হয়েছিল বলে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের প্রায় দেড়শ' ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করেন।

এ সবের উপরেও আবার বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এক ঘোষণা জারী করেন যে, যে-স্কুলের ছেলেরা বিলাতী বর্জ্জনের জন্য কাজ করবে, সে-স্কুলের ছেলেরা সরকারী চাকুরী পাবে না।

এরপর লাট ফুলারের প্রধান মুন্সী লায়ন সাহেব এক সার্কুলার জারী করে রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা নিষিদ্ধ করে দেন। এই সকল সার্কুলার জারির ফলে এক 'এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি' গঠিত হয়। এতে স্থির হয় যে, ছাত্রগণ এসব সার্কুলার মানবে না। ফলে এই সব সার্কুলার অমান্য করে বহু ছাত্র দিনের পর দিন দণ্ডিত হতে থাকে।

ছাত্র-দলন মূলক এ সব সরকারী ব্যবস্থার জন্যই সুবোধ মল্লিকের এক লক্ষ টাকা দানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সূচনা হয়। যে সভায় সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা দান করবেন বলে ঘোষণা করেন, সেই সভায়ই মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা সুবোধ মল্লিককে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সভায়ই আরো প্রায় কুড়ি হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সকল আন্দোলনে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও নানা দায়িত্বভারের জন্য এ সময়ে তিনি প্রায় আত্মগোপন করেই চলতেন।

পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার দত্তের নায়কত্বে স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, তাতে ভীত হয়ে ফুলার সরকার এই

জেলাকে 'প্রক্লেম্‌ড ডিষ্ট্রিষ্ট' অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী জেলা বলে ঘোষণা করে। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে অশ্বিনীকুমার সেখানে অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে মানুষ হবার মন্ত্র প্রচার করতেন। তাঁর চরিত্রবল ও সংগঠনের গুণে এমন একদল একনিষ্ঠ কর্ম্মি জুটে গেল, যাদের প্রচারে সমগ্র জেলায় বিদেশী বর্জ্জন চূড়ান্তরূপে সার্থক হয়ে উঠল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এতে ক্ষেপে গিয়ে একটি বিলাতী দোকানেব বাজার বসিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানে না গেল কোন বিক্রেতা, না এল কোন ক্রেতা। বাজারের একজন মাত্র দোকানদাব আক্ষেপ করে গাইল—'এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই!"

কাজেই বরিশাল জেলার মত ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলও সরকাবেব বিষনজরে পড়ল। সেখানকার প্রতিভাবান্ ছাত্র শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা ও আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়েও বৃত্তি পেলেন না। কিন্তু কোন কিছুতেই বরিশালের কর্ম্মিদিগকে দাবিযে রাখা গেল না।

এসব দেখে শুনে ছোটলাট ফুলার সাহেব ঢাকা থেকে বরিশালে গেলেন, —কিন্তু মনমেজাজ তাঁর বড় খারাপ! কারণ, ঢাকাতে যেদিন গিয়ে তিনি পৌঁছেন, সেদিন বিপিন পালও ঢাকায় যান। হাজার হাজার ছাত্র—শত শত নাগরিক 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করে তাদের নেতাকে ষ্টেশন থেকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেল, কিন্তু লাটসাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করতে রইল মাত্র জনকয়েক সরকারী লোক ও খেতাবধারী খয়েরখাঁ,—লাটসাহেবের মোট বইবার জন্য একটি কুলীও পাওয়া গেল না সহরে। লাটসাহেব চটে আগুন হয়ে রইলেন।

বরিশালেও লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করতে কেউ গেল না। লাটসাহেব রেগেমেগে অশ্বিনীবাবু, রজনীকান্ত দাশ, দীনবন্ধু সেন প্রমুখ বরিশালের বিশিষ্ট নেতাদের ডেকে নিয়ে নিতান্ত অভদ্রোচিত ও অপমানকর ব্যবহার করলেন।

এই সময় থেকেই বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে নরমপন্থী ও চরমপন্থী

দলের কার্য্যক্রম ও মতভেদ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথের মতবাদ অগ্রগামী চরমপন্থী দলের নিকট কতকটা অপ্রিয় হয়ে পড়ল। গোখলের সভাপতিত্বে বারাণসীধামে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাতে অতি মৃদুভাবে যেন কতকটা দায়ে পড়ে কেবল বাংলার জন্য বিদেশী বর্জ্জন ন্যায়সঙ্গত বলে প্রস্তাব গৃহীত হল। কাজেই এতে চরমপন্থীরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

এদিকে ছোটলাট ফুলার সাহেব হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ভেদনীতি প্রচার করতে থাকেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলতে লাগলেন—মুসলমান তাঁর 'সুয়োরাণী' আর হিন্দু হল 'দুয়োরাণী'। সরকারের বড়কর্ত্তারা বিদেশী বর্জ্জন বন্ধ করবার জন্য মুসলমানদের দিয়ে নূতন নূতন হাট বসাতে লাগলেন। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে নানা ভাবে এ সময় থেকে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচারিত হতে লাগল। কিন্তু বহু মুসলমান সরকারের এই অপচেষ্টা সম্বন্ধে সকলকে সাবধান হতে উপদেশ দিতে লাগলেন; তবুও সরকারের অবিরাম চেষ্টায় ধীরে ধীরে ভেদনীতির বিষ বাংলায় বিষমভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দেশের যখন এই রকম পরিস্থিতি, তখন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন—স্বদেশী আন্দোলনের পীঠস্থান বরিশালে। সভাপতি হলেন স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল। ফুলার সাহেবের ব্যবস্থায় বরিশাল সহর এবং জেলার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বহু গুর্খা সৈন্য ইতিপূর্ব্বেই মোতায়েন করা হয়েছিল এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করাও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাণ্ড দুইখানা ষ্টিমারে বাংলার বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ এবং বিশিষ্ট নেতাগণ সভাপতিকে নিয়ে বরিশাল গেলেন। ষ্টিমার থেকে তুমুল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠল, কিন্তু তীরের বিপুল জনতা মূক হয়ে রইল, কোন সাড়া তাদের থেকে পাওয়া গেল না।

পরদিন সভাপতিকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বেরুবার পূর্ব্বেই কয়েকজন

পুলিশেব কর্ম্মচারী নেতাদের বলে গেলেন—সাবধান! বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যেন না হয়, প্রলয় ঘটবে!

শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, তাঁর পুত্র চিত্তবঞ্জন, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির জনকয়েক তরুণ সভ্য। শোভাযাত্রা আরম্ভ হতেই মনোরঞ্জনবাবু পুত্রকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠল, আর অমনি পুলিশের উদ্যত যষ্টিও পড়ল অগ্রগামী দলের মাথায়। লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে চিত্তরঞ্জন পুকুরে পড়ে গেলেন, তখনও অনবরত লাঠি পড়তে লাগল তাঁর উপরে! কিন্তু তাঁর মুখে বন্দে মাতবম্ ধ্বনির বিরাম নেই! এই অবস্থায় একজন পুলিশ এসে তাঁকে তুলে নিলে। এ ছাড়াও বহু লোক আহত হল পুলিশের লাঠির ঘায়ে। এর মধ্যে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, ফণী বাড়ুয্যে প্রভৃতির আঘাত খুবই গুরুতব হয়েছিল।

শোভাযাত্রার অপর অংশে হঠাৎ মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে, ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের কাছে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হল। বিচারের প্রহসনও একটা হয়ে গেল তখনই। বে-আইনি শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য দু'শ টাকা এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা কটূক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন বলে আদালত অবমাননার জন্য আরো দু'শ টাকা জরিমানা হয় সুরেন্দ্রনাথের। টাকা তখনই দেওয়া হল। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে এলেন সভায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাইকোর্ট তীব্র মন্তব্য করে আদালত অবমাননার দায় থেকে সুরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর এই এমার্সনই সুরেন্দ্রনাথ যখন মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন তাঁর মুন্সীগিরি করেছিলেন।

সম্মিলনী সুরু হবার মুখেই আহত চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে সভাতে আনা হল। তাঁদের দেখে অমন ধীরপন্থী ভূপেন্দ্রনাথ বসুও বলে উঠলেন—"আজ থেকে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান সুরু হল।" ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কথা—আজ একচল্লিশ বছর পরে সফল হতে চলেছে।

তুমুল ক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে সেদিনকার সম্মেলন শেষ হল। প্রতিনিধিরা ফেরবার পথে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে যাঁর যাঁর স্থানে ফিরে গেলেন,—এবারে কেউ তাঁদের গতিরোধ করতে এল না।

পরদিন আবার সম্মেলন বসল। পুলিশ সাহেব এসে সভাপতিকে বললেন, রাস্তায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি হবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি না দিলে সভা তিনি হতে দিবেন না। সভাপতি এই হীন প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, সুতরাং বরিশালেব দক্ষযজ্ঞ সেখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ছাত্র-সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হল সাংঘাতিক। বরিশাল সম্মেলনে যে ভীষণ পুলিশী জুলুম হয়ে গেল এবং বাংলার সর্ব্বত্র স্বদেশী দলনের নামে যে জুলুম চলতে লাগল, তাতে ধীরপন্থী নেতৃবৃন্দ স্বভাবতঃই মনে করেছিলেন যে, ছাত্র-সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদ সুরু হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়। কাজে হলও তাই।

এব পরেই এল 'শিবাজী উৎসব'। এই উৎসবে আমন্ত্রিত হযে বালগঙ্গাধর তিলক, ডাঃ মুঞ্জে ও খাপর্দ্দকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলেন। তিলকের উপস্থিতি চরমপন্থী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে এক নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নায়কত্বে উৎসবের অঙ্গস্বরূপ এক স্বদেশী মেলারও ব্যবস্থা হল। মহা উৎসাহে উৎসব উদ্‌যাপিত হল। তিলক এ সময়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার।"

সে বৎসর বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজীও কংগ্রেসের সভাপতিরূপে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করলেন। সরলা দেবীর নেত্রীত্বে এবার থেকে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপিত হল এবং দেশের সর্ব্বত্র যুবকদের মধ্যে শরীর-চর্চ্চা, লাঠিখেলা, অসি শিক্ষা ইত্যাদির জন্য বহু সমিতি স্থাপিত হতে লাগল।

এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা পত্রিকার ভিতর দিয়ে নবযুগের ভাবধারা প্রচার করছিলেন। নবশক্তি, বসুমতী প্রভৃতিও নব ভাবধারার বাহকরূপে জাতীয়তার প্রচার করছিল বাঙ্গালীর মধ্যে। কিন্তু ইংরেজী

কাগজ ভিন্ন সমগ্র ভারতে নব ভাবের প্রচার করা সম্ভবপর নয়। এজন্যই সুবোধ মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির অর্থ-সাহায্যে—'ভারত ভারতবাসীর জন্য' ( India for Indians ) এই বাণী শিরোভূষণ করে বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বের হল। এই সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। শ্রীঅরবিন্দও অচিরেই এতে যোগ দিলেন।

এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হল যুগান্তকারী 'যুগান্তর' পত্রিকা। এর বিপ্লব-মন্ত্র ও পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ শীঘ্রই বাংলার তরুণদের হৃদয় জয় করে ফেলল। এদিকে যতই সরকারী জুলুম চরমে উঠতে লাগল, ততই যুগান্তরের অগ্নিবাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে গুপ্ত-সমিতি গঠন করে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেওয়ার প্রবৃত্তি তরুণদের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল।

অচিরেই সরকারের বিষনজর পড়ল চরমপন্থী এই সকল কাগজের উপর। যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেনবাবু রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হলেন। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বিচারে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল, মুদ্রাকরের হল দু'বছর জেল। নবশক্তির মুদ্রাকরও দণ্ডিত হলেন। সন্ধ্যার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধরা পড়ে, ইংরেজের আদালতের নিকট তাঁর কার্য্যের জন্য কোন জবাবদিহি করতে অস্বীকৃত হয়ে সর্ব্বপ্রথম অসহযোগের সূচনা করলেন। মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের রায় বের হবার পূর্ব্বেই উপাধ্যায় হাজতে মারা গেলেন।

'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দও রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বিচারে বিপিনবাবুর ছয় মাস জেল হল।

যেদিন বিপিনবাবুর বিচার হল, সেদিন আদালতে ভীষণ জনতা হয়েছিল।

একজন সার্জ্জেণ্ট জনতার মধ্যে কয়েকজনকে ঘুষি মারে। সুশীল সেন নামে পনেরো বছরের এক কিশোর সার্জ্জেণ্টের ঘুষিটি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেয়। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড তখনি সরাসরি বিচার করে সুশীলকে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দেন ; আদেশও সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হয়। হাসিমুখে বীরবালক পিঠ পেতে তা গ্রহণ করে।

এদিকে পাঞ্জাব ও বোম্বাইতেও চরমপন্থীদের উপর রাজরোষ পতিত হয়। পাঞ্জাবের 'ইণ্ডিয়া' ও 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হন। লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিং নির্ব্বাসিত হন।

সরকারের এই নির্ম্মম দমন-নীতির ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভীষণ সন্ত্রাসবাদের সূচনা হল। পশ্চিম বঙ্গের ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। মিঃ কিস্‌ংফোর্ড যখন মজঃফরপুরের দায়রা জজ হয়ে যান, তখন উনিশ বছরের তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁরা ভুলে মিঃ কেনেডি নামে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ইংরেজ ব্যবহারজীবের পত্নী ও কন্যাকে নিহত করেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে মুক্তি পান। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়।

এই ঘটনার পরই পুলিশ মাণিকতলায় এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই সংস্রবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীঅরবিন্দও গ্রেপ্তার হন। এই মামলা চলবার সময় সত্যেন ও কানাইলাল, রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যেই হত্যা করেন এবং জেলেই তাদের বিচার হয়ে ফাঁসী হয়। এই মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দেন, মামলার তদ্বিরকারক একজন দারোগা নিহত হন, হাইকোর্টে সরকার পক্ষে মামলা তদ্বিরকারক পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সামসুল আলমও গুলির আঘাতে নিহত হন।

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কঠোর কারাদণ্ড হয়।

এর পর থেকে সারা ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় নির্ম্মম দমন-নীতি চলতে থাকে। এই সন্ত্রাসের যুগে বাংলার নেতারা প্রায় সকলেই দণ্ডিত হলেও, বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায় যে দৃঢ়তা ও অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল, আদর্শবাদী ছেলেরা যেরূপ অটুট বিশ্বাসে জীবন-মরণ তুচ্ছ করে তাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কর্ম্মপথে অগ্রসর হয়েছিল, তার ফলে তাদের প্রচেষ্টাই জয়যুক্ত হল—দেশ স্বদেশী গ্রহণের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেল, আর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ নিজে ভারতে এসে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সোনার বাংলার। একদিন বাঙ্গালী বুকের রক্ত দিয়ে যে বঙ্গবিভাগ রদ করিয়ে নিয়েছিল, আজ সেই বাঙ্গালীই আবার অবস্থার বিপর্য্যয়ে স্বেচ্ছায় বাংলা বিভাগ করে নিল নিজেদেরই মধ্যে। জানি না বাংলা এ অভিশাপ থেকে কবে আবার মুক্ত হবে!

**বন্দে মাতরম্**

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ষাট বৎসর ধরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন, তার লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করা। কংগ্রেসের সেই সংগ্রাম আজ জয়যুক্ত হয়েছে—ইংরেজ আজ ভারতবাসীর হাতে ভারতের শাসন-ভার তুলে দিয়েছে। ভারতবর্ষ দুটি আত্মস্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজেরা সমর্থ হলে, দুটি ডোমিনিয়নই পূর্ণ স্বাধীন হতে পারবে, তার পথে আর কোন বাধাই থাকবে না। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ একসঙ্গে হাত তুলে সে স্বাধীনতা আজ নিতে পারলো না—এক ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল এবং দুই অংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা নিল। এটা হল ইংরেজেরই বুদ্ধি কৌশলে, না আমাদেরই বুদ্ধির দোষে, সেটা ইতিহাস বিচার করবে। তবে বিভক্ত ভারতবর্ষ নিজ নিজ অভিপ্রেত পথে স্বাধীন হল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবীই ভারত-বিভাগ অনিবার্য্য করেছে। মুসলিম লীগ বলেছেন, তাঁরা আলাদা জাতি; তাঁদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনাদর্শ সবই স্বতন্ত্র; সুতরাং তাঁরা স্বাধীন ভারতে একই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে একই শাসনায়ত্তে থাকবেন না। তারা ভারতের মুসলিম-অধ্যুষিত

অঞ্চলগুলিকে একত্র করে আত্মস্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করবেন এবং সেই রাষ্ট্রের তাঁরাই হবেন প্রভু ও শাসক। এই যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র, এরই নাম হ'ল পাকিস্থান।

ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি, এ কংগ্রেস স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন, দুটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও, এঁরা একই সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অধীন, একই ভৌগোলিক গণ্ডীর ভেতর এঁরা আবদ্ধ, কাজেই রাষ্ট্র-জাতি হিসাবে এঁরা দুই নন, এক। আপোষ-নিষ্পত্তির ভিত্তিতে দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত স্বাধিকার সংরক্ষিত হবে, রাষ্ট্র ব্যাপারে এঁরা এক থাকবেন, এই সকল কংগ্রেসের অভিমত। কিন্তু মুসলিম লীগ কোন আপোষ-নিষ্পত্তিব মধ্যে গেলেন না। তাঁরা করলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এর ফলে গ্রাম, নগর, বন্দর ধ্বংস হতে লাগলো; শান্তিপ্রিয় নরনারী প্রাণ হারাতে লাগলেন; সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা বিধ্বস্ত হতে লাগলো। কংগ্রেস তখন দেশ ও জাতির কল্যাণের মুখ চেয়েই ভারত বিভাগ স্বীকার করে নিলেন—তার ফলেই এলো পাকিস্থান। পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও আসাম—এই ছিল লীগ পরিকল্পিত পাকিস্থানের এলাকা। কিন্তু পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের অনেক অঞ্চল হল একান্তভাবে হিন্দু-সংখ্যাধিক এলাকা—তাঁরা পাকিস্থানের ভেতর যেতে রাজী হলেন না। ফলে এগুলির ভেতর পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ এবং শ্রীহট্ট নিয়েই লীগকে সন্তুষ্ট হতে হল। শ্রীহট্ট ছাড়া সমগ্র আসাম, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব রয়ে গেল কংগ্রেসের মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছেন। কাশ্মীরকে চাপ দিয়ে পাকিস্থানে যোগ দেওয়াবার জন্য সেখানে সীমান্তের উপজাতিরা এক সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীর সাময়িক ভাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়ে তার সাহায্যে এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তবে কংগ্রেস মত দিয়েছে যে, গণভোট দ্বারা কাশ্মীরের

ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা হবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত এক মন্ত্রিসভার হাতে কাশ্মীরের শাসন-ভার থাকবে।

মোটের ওপর পাকিস্থান পূর্ব্ব পরিকল্পিত এলাকার চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্থানের এক জলপথে ছাড়া কোন যোগাযোগ রক্ষার উপায় হয়নি। উপরন্তু সমগ্র পাকিস্থান এলাকায় প্রায় তিন কোটি হিন্দু বাসিন্দা থেকে গেছেন, যাঁদের ভৌমিক ও রাজনীতিক দাবী-দাওয়া পাকিস্থানকে মেনে নিতে হচ্ছে। কাজেই খাঁটি মুসলিম রাষ্ট্র ভারতে স্থাপিত হতে পারে না। তাছাড়া পাকিস্থান রাষ্ট্র হিসাবে শিল্পে-বাণিজ্যে এখনো খুবই অনগ্রসর রয়েছে, আর্থিক সঙ্গতিও তার রয়েছে খুবই দুর্ব্বল—প্রায় বাহান্ন কোটি টাকা বাৎসরিক ঘাটতি স্বীকার করে তাঁদের রাষ্ট্র চালাতে হবে। পদে পদেই যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, খাদ্য, কয়লা ইত্যাদির জন্যে তাদেরকে বাইরের বিভিন্ন দেশের মুখ চাইতে হবে। তা না হলে, সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ধ্বসে পড়বে, এমন আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে সাড়ে চার কোটির ওপর মুসলমান প্রজাকে ভারতীয় ইউনিয়নের ভেতর ছেড়ে দিতে হয়েছে। তবু পাকিস্থান ওঁরা কায়েম করেছেন এবং তা করে ভারতের অখণ্ডতাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন। স্বভাবতঃই মনে হয় এটা জিদ এবং এ জিদে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিন্দু-মুসলমান কারুরই কল্যাণ হয়নি। ভারতের জনশক্তি ও ধনশক্তি আজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে এবং যেহেতু বিভাগটা ঘটেছে প্রচণ্ড আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভেতর দিয়ে, তাই অনেকে আশঙ্কা করেছেন, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই পরস্পর-বিরোধী দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বেধে গিয়ে দেশে নিদারুণ দুর্ব্বিপাকই দেখা দেবে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বার বার এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অতীতে ভারতবর্ষ কোন দিন একটা অখণ্ড দেশ ছিল না—ছোট-বড় অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে ছিল ভারতভূমি। হিন্দু আমলে ও মুসলিম আমলে শক্তিশালী শাসকরা বার বার চেষ্টা করেছেন সেই খণ্ড ছিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনতে; কিন্তু

কেউই ষোল আনা সফল হতে পারেননি। ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। হিন্দুস্থান, পাকিস্থান ও আংশিক ভাবে রাজস্থান আজ মাথা তুলেছে। ভবিষ্যতে আরো অনেক স্থানই হয়ত মাথা তুলবে, হয়ত আবাব সেই পুবানো মারামারি কাটাকাটিই নূতন করে ফিরে আসবে। সুতরাং স্বাধীনতা পেয়েও আমরা সমগ্রতা পেলাম না ভারতবর্ষের, দুঃখের সঙ্গে একথা মানতেই হবে। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে, তাতেই এ আখ্যায়িকা বাস্তবে রূপ পেতে সুরু করেছে।

কিন্তু মুসলিম লীগ এই ভাবে ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের বিরোধী দাবী করলেন কেন? অনেকে বলছেন, বৃটিশ শ্রমিক সরকার আজ ভারতকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন, কিন্তু বৃটিশ রণপ্রভু ও ধনপ্রভুদের প্রতিনিধি টোরীদেব এটা অভিপ্রেত নয়। তাই তাঁবা তলা থেকে লীগকে খুঁচিয়ে পাকিস্থান দাবী উপস্থিত করতে প্ররোচিত করেছেন—উদ্দেশ্য এই যে, ভারত স্বাধীন হলেও, তাতে শান্তি থাকবে না, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তিতে দেশ বিধ্বস্ত হবে, সেই সুযোগে তারা আবার এদেশের ওপর চেপে বসতে পারবেন। এ কথা আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ইংরেজ নিয়েছিল মুসলমানের হাত থেকেই। সেই কারণে ইংরেজ সম্পর্কে মুসলমানের মনে ছিল তীব্র একটা শত্রুভাব। ওয়াহাবী আন্দোলন অর্থাৎ ঐস্লামিক সাম্রাজ্য পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলনে এই বৈরিতা এক দিন এমনভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, ইংরেজ তার ধাক্কায় প্রায় কাবু হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের আদিকেন্দ্র ছিল ভারতের বাইরে। সমগ্র জগতেই ঐস্লামিক শক্তিবর্গ অগ্রগামী বণিকশক্তির কাছে যেভাবে নিগৃহীত ও পরাভূত হয়েছে, তা থেকে ইসলামকে মুক্ত করার জন্যে এ আন্দোলন তৈরি হয়েছিল! ভারতীয় মুসলমানের খুব বড় একটা অংশই এ আন্দোলনে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের ওপর

নিদারুণ আক্রমণ চালিয়াছিলেন। কৌশলে আক্রমণের স্রোতকে হিন্দুদের ওপরে ঘুরিয়ে দিয়ে, ভারতব্যাপী সে আন্দোলনকে ইংরেজ যখন দমন করলো, তখন কৌশল হিসাবেই সে এগিয়ে দিল হিন্দু সম্প্রদায়কে শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বে। স্বভাবতঃই মুসলমান সমাজ পড়লো পিছিয়ে। মুসলমানের এই পশ্চাদ্বর্ত্তী অবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছে এবং হিন্দু ধাপে ধাপে যখন আধুনিক উন্নতির দিকে খানিকটা এগিয়েছে, তখন মুসলিম সমাজে দেখা দিলেন সৈয়দ আহম্মদ। তিনি মুসলমানকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার আলোতে এগিয়ে আসতে এবং ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে হিন্দুর একাধিকার খর্ব্ব করতে অনুপ্রেরণা দিলেন। সেখান থেকেই হল ভারতীয় মুসলমান সমাজে নব জাগরণের সূত্রপাত। এই জাগরণের এক দিকে রইলো ভারতীয় হিন্দুদের সম্পর্কে তীব্র প্রতিযোগিতার মনোভাব, অন্যদিকে এলো ভারতের বহির্ভূত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের দূরবিসর্পী আকাঙ্ক্ষা। একই সঙ্গে এই দুই মনোভাবের প্রেরণা জোগাতে লাগলো ওয়াহাবী আন্দোলনের ঐতিহ্য, আর ইংরেজ সেটা লক্ষ্য করে নীতি হিসাবেই তাতে উদ্দীপনা দিতে লাগলো।

ওয়াহাবী আন্দোলনের পরই ভারতে ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে আর একটা বৃহৎ আয়োজন হয়েছিল, সে হল সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে ভারতের হিন্দু-মুসলমান, বিশেষতঃ সামন্ত রাজারা একযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন। কুমারসিংহের নেতৃত্বে ভারতের চাষী ও মজুররা এবং ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপে ও নানা সাহেবের নেতৃত্বে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ একযোগেই ইংরেজকে সশস্ত্র আক্রমণ করেছিলেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও এতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় সে বিদ্রোহও ইংরেজ দমন করলো ; কিন্তু সেখানেই বুঝলো, ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে কোন দিন এক হতে দেওয়া চলবে না, তাহলেই ইংরেজ শাসনের অবসান অনিবার্য্য। তাই সৈয়দ আহম্মদের সময় থেকেই ইংরেজের নীতি হল—

ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই আধুনিকতার পথে এগিয়ে আনা, কিন্তু দুইয়ে কোন রকমেই মিলন হতে না দেওয়া। হিন্দু ইংরেজের কৌশল বুঝতে পারলো, তখন থেকেই তাই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আন্দোলন সুরু করলো। কিন্তু মুসলমান হয় এটা বুঝলো না, নয় বুঝেসুঝেই এটা মেনে নিল, উন্নতির প্রতিযোগিতায় হিন্দুর নাগাল ধরার উপায় হিসাবে। হিন্দুবিদ্বেষ তাই তখন থেকেই মুসলিম রাজনীতির একটা প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়ালো। তাঁরা বলতে লাগলেন,—তাঁরা ভিন্ন জাতি, তাঁদের সংস্কৃতি ভিন্ন, তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে এক হযে থাকবেন না। বাইরের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিতালী করে, তাঁরা 'নিখিল মুসলিম সৌভ্রাতৃসঙ্ঘ' গঠন করবেন—স্যার মহম্মদ ইকবাল এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করে স্মরণীয় হয়েছেন।—( পাকিস্থান কথাটি তাঁরই সৃষ্টি। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচিস্থান, এই ক'টি স্থানের নামের এক এক অক্ষর নিয়ে গঠিত এই 'পাকিস্থান' শব্দটি আগে বাংলা ও আসামকে আপন এলাকার মধ্যে ধরেনি। পরে জিন্নার আমলে যখন রাজনীতিক পাকিস্থানের আন্দোলন সুরু হয়, তখনই সব চেয়ে মুসলিম সংখ্যাধিক অঞ্চলরূপে বাংলা তাতে স্থান পায়) অর্থাৎ এইভাবে ওয়াহাবী আন্দোলন ও বৃটিশ ভেদনীতির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া থেকেই ভারতে মুসলমানের পৃথক জাতিত্ব এবং পৃথক রাষ্ট্রের দাবী আত্মপ্রকাশ করলো। জিন্নার নেতৃত্বে সেই দাবী যখন রাজনীতিক আন্দোলনের রূপ নিল, তখন আর এটা বৃটিশ কুটনীতির খেলা নয়—তখন এটা ভারতীয় মুসলমান সমাজের বেশীর ভাগ অংশেরই আন্তরিক দাবী। কাজেই পাকিস্থান দাবীকে টোরী রাজনীতির খেলা মাত্র বললে, মুসলিম অভ্যুদয়ের আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বাপর আন্দোলনেরই এটা অনিবার্য্য পরিণতি এবং সেই পরিণতির পথে ইংরেজের মস্ত খেলা আছে, একথা অবশ্য ঠিক। যাঁরা ধর্ম্মনীতিক পাকিস্থানের প্রাথমিক পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি ভাবিক ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে।

তখনো সংঘাত, সংঘর্ষ ও স্বাধিকারের কোন কথাই তাঁদের মনে ছিল না, তাই তা হিন্দুবিদ্বেষও রূপান্তরিত হতে পারেনি। ওঁদের দাবীটা ছিল সাংস্কৃতিক, সেই কারণেই শান্ত। ক্রমে তাতে এলো উগ্রতা, এলো আক্রোশ এবং অসূয়ার ভাব। ওঁদের এই ক্রমিক রূপান্তরের পথে ইংরেজের অদৃশ্য হাত আছে, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এর পেছনে মুসলমানের নিজস্ব গরজও কম নেই। মুসলমানের মনকে এই ভাবে তৈরি করে দিয়ে ইংরেজ তাই সরে দাঁড়াতে পেরেছে।

কংগ্রেস এটা টের পেয়েছিলেন, এ আগেই বলেছি। তাঁরা তাই গোড়া থেকেই ভারতীয় মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসের ভেতর আনার চেষ্টা করেছিলেন—খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে, আলি-ভ্রাতৃবৃন্দকে কংগ্রেসে আনায় এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম মিলনের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। প্রভাবশালী ভারতীয় মুসলিম সমাজের খুব বড় একটা অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে এসেও ছিলেন, এবং তাঁরা অনেক ত্যাগ ও লাঞ্ছনা-বরণও করেছিলেন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদান করে। স্বয়ং মিঃ জিন্নাও ছিলেন কংগ্রেসেই। কি কারণে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছেন, এতে ভারতীয় মুসলিম সমাজের কোন লোকসান হয়েছে কিনা, সে আলোচনা আজো করার সময় আসেনি। যাই হোক, আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো পৃথক নির্ব্বাচন এবং সেখান থেকেই মুসলমানের রাজনীতিক স্বার্থ হিন্দুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল। মুসলিম লীগ এর আগে ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান—এখন তা হলো রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং তার নেতা রূপে জিন্না সাহেব দাঁড়ালেন কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। তিনি হিটলারী Lebensraum আন্দোলনের মতো মুসলিম অভ্যুদয়ের আন্দোলন সুরু করলেন। তিনি বললেন, মুসলমানের নিজস্ব রাষ্ট্র চাই। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, তা যদি ভারতের স্বাধীনতা আনে, তা'হলে ভারতের নয় কোটি মুসলমান চিরদিনের জন্যে

হিন্দুর ক্রীতদাস হবে। সুতরাং হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র হও, স্বাধীন মুসলিম-স্থান গড়ে তোলো। অজ্ঞ ও অনগ্রসর মুসলিমের মনে বিপন্ন ইসলামের ধুয়া তুলে তিনি মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করলেন। হিন্দুদের সুখসমৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এ আবহাওয়ায় যখন নূতন ভারতশাসন-আইনে প্রাদেশিক শাসনাধিকার মঞ্জুর করা হলো, তখন মুসলিম লীগ ভারতের কয়েকটি স্থানে শাসনতন্ত্র দখল করে বসলো এবং স্বপ্নের পাকিস্থান তখন থেকেই বাস্তবে রূপ নিতে আরম্ভ করলো। এর পরের ধাপ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় যার আরম্ভ এবং ভারত-বিভাগে যার শেষ। সুতরাং ধাপে ধাপেই মুসলিম রাজনীতি পাকিস্থানের পথে অগ্রসর হয়েছে, এ একদিনের সৃষ্টি নয়। এর কতকটা উদ্দীপনা দিয়েছে ইংরেজ, কতকটা প্রচ্ছন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু কংগ্রেস এর স্রোতে বাধা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে, সেখানেই হলো এর আসল জোর। মুসলিম-জনশক্তিকে লীগ যে ভাবে পাকিস্থানের নেশায় মাতাল করতে পেরেছে, কংগ্রেস সেভাবে স্বাধীনতার নেশায় তাদের মাতাতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী মুসলিম, খাকসার, অহ্‌র্‌র, মোমিন ও উদারনীতিক মুসলিমদের একটি দল বরাবরই কংগ্রেসে ছিলেন—এঁদের বাইরে যে বৃহৎ ভারতীয় মুসলিম সমাজ আছেন—চাষী, মজুর ও সাধারণ গৃহস্থ, তাঁদেরকে কংগ্রেসের পথে আকর্ষণের কোন চেষ্টাই হয়নি। পক্ষান্তরে মোল্লা, মৌলভী ও বেতনভুক প্রচারক মারফৎ লীগ তাঁদের পাকিস্থানের পথে বিপুল ভাবেই আকর্ষণ করতে পেরেছেন। এই খানেই হলো তাঁদের সাফল্য। কংগ্রেসের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ একটি আদর্শের ওপর—লীগ বেছে নিয়েছে সংঘর্ষের পথ, কাজেই তার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই জয়ী হয়েছে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু আগেই বলেছি, ভারত-বিভাগ হিন্দু-মুসলমান কারুর পক্ষেই কল্যাণাবহ হয়নি। হিন্দুই এদেশের প্রাচীন অধিবাসী, মুসলমান এসেছিলেন

পরে। খাঁটি মুসলমান এদেশে কমই এসেছিলেন। এদেশেরই নানা অনুন্নত সম্প্রদায় বিবিধ কারণে ইসলাম ধর্ম্ম নিয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু যেভাবেই হোক কালক্রমে হিন্দু-মুসলমান দুইই এদেশের বাসিন্দা হয়েছিলেন। দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সবই গড়ে উঠেছিলো উভয়ের সম্মিলিত দানে। দুই সম্প্রদায়ে বিরোধবিদ্বেষ মারামারি না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু মেলামেশাটাও হয়েছে গভীর ভাবেই। হিন্দুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি মুসলমান সানন্দে গ্রহণ করেছে, মুসলমানের প্রবর্ত্তিত শত শত শব্দ হিন্দু আপন ভাষায় গ্রহণ করেছে। তার আদব-কায়দা, পোষাক-পরিচ্ছদ স্বচ্ছন্দে অনুসরণ করেছে, সুখে-দুঃখে দুইয়ে এক হয়ে বাসও করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ছোট ছোট হিন্দু ও মুসলমান জমিদার এক হয়ে দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এমন নজীর ইতিহাসে কম নেই। সিপাহী যুদ্ধ থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্য্যন্ত তারই ধারা বয়ে এসেছে। এমন কি, আজো বহু বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসের ভেতর রয়েছেন এবং অখণ্ড ভারতের সামগ্রিক স্বাধীনতাকেই তাঁদের আদর্শ বলে স্বীকার করেছেন। কাজেই যাকে Political Nation বা রাষ্ট্রজাতি বলা যাবে, তাতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুটি জাতি কোন দিন ছিল না, আজো নেই—আজো দুইয়ে একই যৌথ সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অধীনে রয়েছেন। তবে পাকিস্থান যদি অতঃপর শরিয়ত-সম্মত দার-উল-ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র গড়েন, তা'হলে হয়ত তা হবে এবং তা'হলে কি হবে, সে ত আগেই বলেছি। কিন্তু সে ভয় না করার সপক্ষে একটা যুক্তি আছে—ভারতের সাংস্কৃতিক আদর্শ চিরদিন ঐক্যের অভিমুখে, সমস্ত বিরোধ ও বিভেদকে সমন্বয়ের দিকে নিয়ে আসার অভিমুখে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সেই প্রাণগত ঐক্যই ভারতকে আবার এক করবে এই আশা নিয়েই আজ নবাগত স্বাধীনতাকে, নূতন জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করি। আজ কামনা করি, ভারতের জনশক্তি, হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত শক্তি একদিন জাগবে এবং এই কৃত্রিম ভেদ-

বিভেদকে বিচূর্ণ করে, নূতন দেশ, নূতন রাষ্ট্র গড়বে, যাতে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন থাকবে না, থাকবে মানুষের প্রশ্ন,—যে মানুষ বিশ্বমানবের সুহৃদ! সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশব্রতী বহু হিন্দু-মুসলমানই এ কামনা করেন। এতেই মনে হয়, এ কামনার পেছনে আছে ভারতবাসীর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের সুগভীর একটি সমর্থন।

———

# স্বদেশী গান

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ' !
(কোরাস্) কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'।

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাদের জননী,
তুই কি না মাগো তাদের দেশ !
(কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ !
(কোরাস্) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো না সেই ধন্য দেশ।
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।
( কোরাস্ ) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা, ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ!
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
( কোরাস্ ) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

২

রাম রহিম না জুদা কর ( ভাই ), মনটা খাঁটী রাখজী ;
দেশের কথা ভাব ভাইরে! দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দু মুসলমান, এক মায়ের সন্তান, তফাৎ কেন করজী।
দুই ভাইয়ে দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি।
কাপড়, জুতা, লবণ, চিনি, ছুরি, কাঁচি বিলাতী।
( মোদের ) ভাইরা সকল পায় না খেতে, জোলা কামার আর তাঁতি।
টাকায় ছিল মণেক চাল ভাই! এখন বিকায় পসুরি।
এর পরে ভাই, হ'তে বাকি গাছের তলে বসতি।
দেশের দিকে চাও ফিরে, ( ভাই ) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয় রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুঁসি।

—অজ্ঞাত

# রক্তবিপ্লবের বাংলা

## কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

পলাশির রণক্ষেত্রে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজ যেদিন ভারতে নিজেদের দুঃশাসনের সূচনা করল, তার ঠিক একশ' বছর পরে সম্মিলিত ভারত তার স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেছিল। সে যুদ্ধকে তুচ্ছ করে দেখাবার জন্যে ইংরেজ তার নাম দিয়েছে 'সিপাহি-বিদ্রোহ', কিন্তু সগৌরবে আমরা তাকে চিরকাল 'ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ' বলেই স্মরণ করব।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভারত সেদিন পরাজিত হয়েছিল। সেই পরাজয়ের গ্লানি কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহের নিশান তুলল শিবাজীর মারাঠায় বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রেরণায়। কিন্তু সেই বিপ্লবের, আর সারা ভারতের বিপ্লবের কাহিনী অতি সংক্ষেপ বলতে গেলেও মহাভারত রচিত হয়ে উঠবে। তাই এখানকার সীমাবদ্ধ জায়গায় আমরা আজ শুধু বাংলাদেশেরই রক্তাক্ত বিপ্লবের কাহিনী আলোচনা করছি।

বাংলাদেশে আঠারশো-পঞ্চাশ সালেরও আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠন করে তার মারফত বাঙালীর মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। ১৮৬৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর এই মেলা বসত, তাতে স্বদেশী জিনিসের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকত। এই মেলার সাহায্যে জাতির মনে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার প্রীতি প্রচার করা হত। এ সময়

বাংলাদেশে বহু প্রতিভাবান মনীষীর অভ্যুদয় ঘটে ; তাঁদের সাহিত্যে আদর্শে প্রচারণায় বাঙালী জাতীয়ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় বাংলার পলাশিতে, বাঙালীর মনে তার জ্বালা অনুক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, তারপর ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয় বাংলাদেশের বারাকপুরে। এদিকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বাংলার মনীষীরা আদর্শে, রাজনীতিতে, ধর্মে বাঙালীর মনে বিপ্লব ঘনিয়ে তুললেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলার গগনে কবি-রবির উদয়েরও তখনই সূচনা—১৮৭৫ সালের হিন্দুমেলার অধিবেশনে নিজের রচিত জাতীয়তার উদ্দীপক একটি কবিতা পাঠ করেন, কবির বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর।

১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদার গাইকোয়াড়ের রাজসরকারে উচ্চ কর্মচারী। সেখান থেকেই তিনি পুণার বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে বিপ্লবী কাজের দীক্ষা নেন। যতীন বাঁড়ুয্যে ছিলেন গাই-কোয়াড়ের দেহরক্ষী ; সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি সরলা দেবীর নামে অরবিন্দের এক পত্র নিয়ে এলেন বাংলাদেশে—মহারাষ্ট্রের বিপ্লবচেষ্টা বাংলার মাটিতে রোপিত হল। কলিকাতার ১০২নং সার্কুলার রোডের বাড়িতে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হল। অরবিন্দের যোগ্য ভ্রাতা বারীন ঘোষ ১৯০৩ সালে সেখানে যোগ দিলেন। গ্রে স্ট্রীটের এক বাড়িতে সুগোপনে এঁরা নিজেদের প্রচারপুস্তক প্রভৃতি ছাপবার ব্যবস্থা করলেন।

বাঙালীর সেদিনকার বিপ্লবী মনের পরিচয় পেয়ে বাঙালীজাতির মধ্যে বিভেদ গড়ে তোলার কুমতলবে তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাদেশকে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ এই দুই প্রদেশে ভাগ করে ফেললেন।

বাঙালীর জাগ্রত মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ ক'রে। সভায়, শোভাযাত্রায়, হরতালে, বিলেতি কাপড় ও বিলেতি জিনিস বর্জনে

সারা দেশময় তুমুল এক আন্দোলন জেগে উঠল। বাঙালীর ওপর চলল নৃশংস ইংরেজী অত্যাচারের কশা। কার্জনের নূতন-গড়া প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের লাট ফুলারসাহেব লোকের ওপর নির্মম অত্যাচার করেও যখন আন্দোলন কিছুমাত্র দমাতে তো পারলেন না বরং বাড়িয়েই তুললেন, তখন বিব্রত হয়ে তিনি ধমক দিলেন—এ বিদ্রোহ দমাবার জন্যে 'রক্তপাত প্রয়োজন হতে পারে'। বাঙালী তার উত্তর দিল শুধু বিদ্রোহে নয়—গান বাঙালীর প্রাণের সম্পদ, বাঙালী গানে হাসে, গানে কাঁদে, গানে তার জাতীয়তার মন্ত্র—গানে বাঙালী উত্তর দিল—

"আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবে,
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পলাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে!"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। কিন্তু কংগ্রেসের কাজ ছিল তখন আবেদন নিবেদনে ইংরেজের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় স্বার্থ উদ্ধার করা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা তখন কংগ্রেসের নীতির বাইরে ছিল। বাংলাদেশ আশা করেছিল যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কংগ্রেস বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু কংগ্রেস সেদিনও বিদ্রোহী হল না। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 'চরমপন্থীরা' তখন দলে দলে কংগ্রেস ছাড়তে লাগলেন, আর আবেদন-নিবেদনসর্বস্ব 'নরমপন্থীরা' রইলেন কংগ্রেস আঁকড়ে। চরমপন্থীরা নিজেদের সংবাদপত্র মারফত বিদ্রোহ ছড়াতে লাগলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন দত্তের এক বছরের কারাদণ্ড হল ১৯০৬ সালে; এই বছর শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় এসে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে

ইংরেজের আদালতে মামলা রুজু হল। এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিন পালের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে আদালতে অভিযুক্ত করা হল। তিনি বললেন যে, স্বাধীনতার চেষ্টায় তিনি যা করেছেন সেটা অপরাধ নয় এবং তার জন্য জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। তিনি বললেন, 'ফিরিঙ্গিরাজ আমায় জেলে পুরবে তার সাধ্য কি?' সত্যই, তাঁকে জেলে দিতে পারার আগেই, তাঁর মামলা চলবার সময়েই দেহে অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

দিকে দিকে সাড়া দিয়ে উঠল বাঙালীর হিংসবিপ্লব। কার্জনের নূতন-গড়া পশ্চিমবঙ্গের লাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল চন্দননগরের কাছে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিছুদিন পরে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর লাটসাহেব রেলগাড়িতে যাচ্ছিলেন মেদিনীপুরে। খড়গপুরের কাছে বিপ্লবীদের চেষ্টায় তাঁর ট্রেন উল্টে যায়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে লাটসাহেব বেঁচে যান। ২৩ ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার পূর্ব্বতন ম্যাজিস্ট্রেট এলেনকে হত্যার চেষ্টা হয়। তারপর কুষ্টিয়ার পাদ্রি হিকেনের ওপর গুলি চলল। চন্দননগরে এক স্বদেশী সভার আয়োজন হয়, কিন্তু সেখানকার মেয়র সেই সভা হতে দিলেন না, তাই ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়।

কিংস্‌ফোর্ড সাহেব ছিলেন তখন কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরই আদালতে 'যুগান্তর,' 'সন্ধ্যা' আর 'বন্দেমাতরম্' এর মামলার বিচার হয়। কিংস্‌ফোর্ডের আদেশে সুশীল সেন নামে একটি তেরো বছরের ছেলের ওপর পনরো ঘা বেত মারা হয়। এর পর কিংস্‌ফোর্ড বদলি হয়ে গেলেন মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকী নামে দুটি বিপ্লবী কিশোর গোপনে বাংলাদেশ থেকে মজঃফরপুরে গিয়ে হাজির হল কিংস্‌ফোর্ডের ওপর প্রতিশোধ নিতে।

কিন্তু কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি ভুল করে যে গাড়ির ওপর বোমা ফেলা হল,

ফাঁসীর সত্যেন

তাতে যাচ্ছিলেন মিসেস কেনেডি নামে একজন মহিলা আর তাঁর মেয়ে মিস্ কেনেডি। মা-মেয়ে দু'জনেই মারা গেলেন। ক্ষুধিরাম আর প্রফুল্ল আলাদা আলাদাভাবে গেলেন মোকাম স্টেশনে। ওয়ানি স্টেশনে পুলিস ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করল। মোকামা স্টেশনে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হলে প্রফুল্ল নিজের পিস্তলে নিজের বুকে গুলি করে মরলেন। আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। আজও বাংলার পথে-ঘাটে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পল্লীগীতিতে লোকের চোখে অশ্রু ঝরে।

মজঃফরপুরের এই বোমাকাণ্ডের সূত্র ধরে পুলিস কলিকাতার মানিকতলার এক বাগানবাড়িতে তল্লাসী করে প্রকাণ্ড এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল। অনেক বোমা-বন্দুক-পিস্তল পুলিসের হাতে পড়ল, বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে, উল্লাসকর প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ ঘোষ। চৌত্রিশ জনকে আসামী করে শুরু হল আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

বাপের প্ররোচনায়, ছাড়া পাবার জন্য বন্দীদের মধ্যে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে বিপ্লবীদলে সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবার জন্য তৈরি হলেন। রোগের ছল দেখিয়ে পুলিস তাঁকে অন্য সব বন্দীদের থেকে আলাদা করে নিয়ে জেল-হাসপাতালে রাখল। এই জেনে মামলার অন্য দুজন আসামী কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসু পীড়ার ছল করে হাসপাতালে গেলেন, গোপনে সঙ্গে ক'রে নিলেন রিভলভার, তার গুলিতে হাসপাতালে নরেন গোঁসাইকে তাঁরা হত্যা করলেন। কানাইলাল আব সত্যেনের ফাঁসিতে প্রাণ গেল।

আলীপুর মামলায় আসামীপক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন। বারীন ঘোষ আর উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হল, উপেন বাঁড়ুয্যে সহ দশ জনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ, বাকি আসামীদের দশ থেকে পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর আর কারাদণ্ডের হুকুম হল।

এসব দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হল। তার ফলে বারীন আর উল্লাসের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বাকি সকলেরও দণ্ড কিছু কিছু কমল।

এই মামলায় সরকারীপক্ষের উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। কিছুদিন পরে পুলিসকোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিপ্লবীর বন্দুকের গুলিতে তাঁর প্রাণ গেল; হত্যাকারী ধরা পড়ল এবং ফাঁসিতে প্রাণ দিল। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষীসাবুদ জোগার করেছিলেন ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সামসুল আলম। ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে একদিন হাইকোর্টের দরজায় ধীরেন দত্তগুপ্ত নামে এক তরুণ গুলি করে সামসুলকে হত্যা করলেন। ধীরেনের ফাঁসি হল। বাংলাদেশময় তখন ইংরেজরাজের পুলিসের উন্মাদ-অত্যাচারের তাণ্ডব চলতে লাগল। কিন্তু মৃত্যুপণ নিয়ে যাঁদের ব্রত আরম্ভ সেই বিপ্লবীরা তাতে পরোয়া করলেন না।

বাংলায় দুটি বিপ্লবীদল তখন প্রধান—'যুগান্তর' দল আর 'অনুশীলন' দল। বিপ্লবী কাজের সঙ্গে সঙ্গে যুগান্তর দলের এক প্রধান কাজ হল পত্রিকা, বই প্রভৃতির মারফত বিপ্লবের প্রচার করা। এর ফলে দেশময় বিরাট একটি তরুণ বিপ্লবীদল গড়ে উঠে মৃত্যুপণ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। বিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠল অনুশীলনদল। ব্যায়ামচর্চার মারফত এঁদের বিপ্লবচর্চা দেশময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ দলের প্রধান কর্মস্থল ছিল কলিকাতা আর ঢাকা। শুধু ঢাকাতেই অনুশীলনদলের পাঁচশো শাখা ছিল।

এ ছাড়া আর একটি দল ছিল বিপিন গাঙ্গুলির দল। এঁদের রাখাঢাকা বিশেষ ছিল না। সুযোগ পেলেই দেশের শত্রু বিনাশ করা ছিল এঁদের মূল কাজ। বিপ্লবী কাজে অনেক টাকাকড়ি দরকার। গোড়ার দিকে দেশের কয়েকজন ধনী এতে বেশ অর্থসাহায্য করলেন। কিন্তু ক্রমে নানা স্বার্থের প্রলোভনে এঁরা ইংরেজের বন্ধু হয়ে উঠতে লাগলেন; তাঁদের সাহায্যও বন্ধ

হতে লাগল। বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা ডাকাতি করে বিপ্লবী কাজের জন্যে ধনীদের টাকা ছিনিয়ে আনতে লাগলেন; এরই নাম হল স্বদেশী ডাকাতি। এই স্বদেশী ডাকাতির কাজে বিপিন গাঙ্গুলীর দল ছিল চিরনির্ভীক। এঁদের এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যখনই কিছু টাকাকড়ি বা অস্ত্রশস্ত্র জোগার করতে পারতেন, সকল দলের মধ্যে তা ভাগ করে দিতেন। টিটাগড়ে মাটির তলায় বিপিন গাঙ্গুলির এক গোপন বোমা-তৈরির কারখানা আর অস্ত্রাগার ছিল। বিপিনবাবু একবার যখন পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন, তাঁর কাছ থেকে গোপন তথ্য আদায় করবার জন্য পুলিসের কর্তারা ওপরে দুটি কড়ার সঙ্গে দু'হাত বেঁধে তাঁকে ঝুলিয়ে রাখল। সে অবস্থায় পাঁচ দিন তাঁর ওপর চলল নির্মম বেত্রাঘাত, জলের তৃষ্ণায় পুলিস তাঁর মুখের কাছে তুলে ধরল ভাঁড় ভরে প্রস্রাব আর খিদেয় তুলে ধরল বিষ্ঠা। ঝুলন্ত পায়ের এক লাথিতে তিনি এক পুলিস-অফিসারকে ধরাশায়ী করলেন। সেখান থেকে 'সেল'এ নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটি গোপন কথা বের করা সম্ভব হল না। এমনি করে গোপন কথা ফাঁস করবার জন্যে বিপ্লবীদের ওপর চলত বর্বর অত্যাচার, তাঁদের আঙুলের ডগায় নখের সন্ধি-স্থানে ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হত, বাঁশডলাই করা হত, তাঁদের দেহ উলঙ্গ করে বেতের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হত; কিন্তু গোপন তথ্য সম্বন্ধে প্রায় সকল বিপ্লবী ছিলেন চিরমূক। এসব অকথ্য অত্যাচার সইতে না পেরে এক এক সময় এক আধজন রাজসাক্ষী হয়েও দাঁড়াতেন।

১৯০৮ সালে অনুশীলনদলের নায়ক পুলিন দাসকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল, কিন্তু ১৯১০ সালে তাঁকে আবার ঢাকায় তাঁর বাড়িতে ফিরতে দেওয়া হল। সম্রাটের বিপক্ষে যুদ্ধ-আয়োজনের অপরাধে সেই বছরই পুলিনবাবু সমেত তেতাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে ঢাকায় এক মামলা দায়ের করা হল, আরও চৌদ্দজনের সাত থেকে দুবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের হুকুম হল।

ঢাকা জেলার সোনারঙে ১৯০৮ সালে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হয়। এখানে লেখাপড়া আর হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হত, তা ছাড়া ছাত্রদের ব্যায়াম আর লাঠি-অসি-ছোরা চালনা শিক্ষা দেওয়া হত। ১৯১১ সালে সোনারঙে এক ডাক-পিওনের কাছ থেকে স্বদেশী ডাকাতেরা সরকারি টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ উপলক্ষে সোনারঙ জাতীয় বিদ্যালয়ের চৌদ্দজন শিক্ষক আর ছাত্র গ্রেপ্তার হন, তার মধ্যে সাতজনের দণ্ড হয়। এর কিছুদিন পরেই, এ মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল এমন তিনজন লোক বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

ইংরেজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল যে, বঙ্গভঙ্গ করে তারা প্রকাণ্ড ভুল করেছে। কিন্তু অন্যায়ের দম্ভে যারা দর্পিত, তারা ভুল স্বীকার করাকে লজ্জাকর মনে করে। তাই ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর যে দিল্লী দরবার হল, সেখানে ইংরেজরাজ বাংলার নূতন সীমানা ঠিক করে দিল।

তখন আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর আর উড়িষ্যা ছিল বাংলাদেশেই সংযুক্ত। নূতন ব্যবস্থায় গোটা বাংলা থেকে এক দিকে আসামকে, অন্যদিকে বিহার, ছোটনাগপুর আর উড়িষ্যাকে শাসনকাজের সুবিধার ছলে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হল, মাঝখানে পূর্ব্ব আর পশ্চিম বাংলা জুড়ে গিয়ে আবার একই প্রদেশ বলে গণ্য হল।

এমনি ভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ করার পরও ইংরেজ-শাসকের অত্যাচার আগেরই মত চলতে থাকল, যাতে দেশবাসীর বিপ্লব-আন্দোলন দমিত হয়। তাতে বিপ্লবীদের দমন হল না কিছুমাত্র, গোপনে তাঁদের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে লাগল। ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ফরাসীদের অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে গিয়ে যোগসাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি আজকের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

১৯১২ সাল থেকে বিপ্লবীদের কাজের ধারা নূতন পথ ধরল। ভারতের বিপ্লবীরা বাইরের শক্তির সঙ্গে যোগ স্থাপন করলেন, বাইরের শক্তির সাহায্যে ভারতে ইংরাজ-শাসনের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই বাইরের শক্তি হল ইংরেজের শত্রু জার্ম্মানী। ভরেতের বিপ্লবীরা জার্ম্মান

সরকারের সঙ্গে এই শর্তে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে যে, জার্মানীর কাছ থেকে জাতীয় হিসেবে টাকা কর্জ নেবে বিপ্লবী যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্যে এবং ভারত স্বাধীন হলে তা শোধ দেবে, আর জার্মানী ভারতকে জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে স্বাধীনতা-যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে। ঠিক হল যে, উড়িষ্যার বালেশ্বরে এসব অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ থেকে গোপনে নামানো হবে এবং সুন্দরবন, হাতিয়া আর কলিকাতায় সে সব ভাগ করে রেখে দেওয়া হবে। হরদয়াল, মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, চন্দ্র চক্রবর্তী, হেরম্ব গুপ্ত প্রভৃতির চেষ্টায় জার্মানীর সঙ্গে ভারতের এই সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৪ সালে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সেই সুযোগে যুদ্ধরত বৃটিশের বিরুদ্ধে মারণ-আঘাত হানবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। ভারতের সর্বত্র তখন বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র আর সংঘশক্তি গড়ে উঠেছে। এক-একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বা অঞ্চল দখল করবার কিংবা এক-একটা বড় বড় ধ্বংসাত্মক কাজের ভার পড়ল এক-একজন বড় বড় বিপ্লবীর ওপর।

জার্মানীর অস্ত্র আর অর্থ আমদানির কাজে সাহায্য করবার জন্য ভোলানাথ চাটুয্যে গেলেন ব্যাংককএ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য গেলেন বাটাভিয়ায় (এই নরেন্দ্র ভট্টাচার্যই পরে নাম নেন মানবেন্দ্রনাথ রায়), অবনী মুখুযো গেলেন জাপানে। বাটাভিয়ার জার্মান কনসাল হেলফারিখএর কাছে খবর পাওয়া গেল যে, এক জাহাজ-ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য আর টাকা জার্মানী থেকে ভারতে রওনা হয়েছে। ঠিক হল, সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক জায়গায় সে সব খালাস করা হবে। বাটাভিয়া থেকে কয়েক বারে কিছু টাকা ইতিমধ্যেই ভারতে এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষবারে যে দশ হাজার টাকা আসছিল, ভারতের পুলিস সন্দেহক্রমে তা আটক করে ফেলে।

এদিকে বিপ্লবীরা যুদ্ধ ঘোষণার তোড়জোড় ঠিক করে ফেলল। রেলপথে যাতে বৃটিশের সৈন্য চলাচল না করতে পারে, তার জন্যে ঠিক হল যে, বড় বড় রেলপুলগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে। যতীন মুখুয্যে (বাঘা-যতীন) ছিলেন

কলিকাতার পাথুরেঘাটায়; তাঁদের দলের পিছু লেগেছে সন্দেহে নীরদ হালদার নামে একজন লোককে গুলি করে মারলে পুলিস তাঁর পিছু নেয়; তিনি পালিয়ে চলে যান বালেশ্বরে। সেখানে থেকে তিনি মাদ্রাজ রেলপথ বিগড়ে দেবার ভার নেন। বেংগল নাগপুর রেলপথ অচল করে দেবার জন্য ভোলানাথ চাটুয্যে যান চক্রধরপুরে। সতীশ চক্রবর্তী নিলেন অজয়নদের ওপরকার পুল ধ্বংস করবার ভার।

বাংলায় নরেন চৌধুরী আর ফণী চক্রবর্তীর ওপর পূর্ববঙ্গ দখলের ভার পড়ল; পশ্চিমবঙ্গ আর কলিকাতা দখলের ভার পড়ল বিপিন গাঙ্গুলী আর নরেন ভট্টাচার্যের ওপর।

জার্মানীর মসা নামে এক জায়গায় তৈরি ভয়ংকর জাতের পিস্তলের নাম 'মসার পিস্তল'। ১৯১৪ সালে বিপিন গাঙ্গুলী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করলেন যে, কলিকাতার রডা কোম্পানির নামে কিছু মসার পিস্তল আর গুলি হাওড়া ষ্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে। বিপিন গাঙ্গুলী সদলে গিয়ে অতর্কিত আক্রমণে পঞ্চাশটা মসার পিস্তল আর ছচল্লিশ শ' গুলি লুঠ করে নিয়ে এলেন এবং সব দলের মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দিলেন।

যদুগোপাল মুখুয্যে মাল-খালাসের ব্যবস্থা সব ঠিক করে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অপেক্ষা করতে লাগলেন; কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায়—জাহাজের দেখা নেই। সে জাহাজে পাঁচ হাজার রাইফেল আর তার পরিমাণ গুলি-বারুদ আসছিল। কিন্তু পুলিস এ খবর পেয়ে গেল, অমনি চতুর্দিকে ধরপাকড় শুরু হল। অতঃপর কি করা যায় তারই পরামর্শ করবার জন্য নরেন ভট্টাচার্য গেলেন হেলফারিখের সঙ্গে দেখা করতে বাটাভিয়ায়।

এদিকে ম্যাভেরিক নামে একখানা জার্মান জাহাজ ভারতেয় বিপ্লবীদের জন্য গুলি-গোলা, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই হয়ে আসছিল; উড়িষ্যার মহানদীর তীরে সে সব নামানো হবে ঠিক হয়। উড়িষ্যার বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্‌পোরিঅম' নামে একটা দোকান খুলে যতীন মুখুয্যেও সদলে অপেক্ষা

করতে থাকেন। পুলিস এই দোকানের গোপন উদ্দেশ্য টের পেয়ে বিপ্লবীদের পিছু নেয়। নীরেন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন আর জ্যোতিষ নামক চারজন বিপ্লবী সঙ্গীকে সাথে নিয়ে যতীন মুখুয্যে পালিয়ে চললেন। মহানদী পেরিয়ে তাঁরা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। কলিকাতার তখনকার পুলিস-কমিশনার টেগার্টের অধীনে একদল সশস্ত্র পুলিস তাঁদের তাড়া করে চললেন। একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্যও চলল পুলিসের সাহায্য করতে। বুড়িবালাম নদীর তীর পর্যন্ত গিয়ে যতীন মুখুয্যেরা আর পালাতে না পেরে ইংরেজ সৈন্য আর পুলিস-দলের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। ইংরেজদলে বহু লোক আহত হতে লাগল, কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন লোক কতক্ষণ লড়তে পারে! কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যতীন মুখুয্যে মারাত্মক আহত হন, চিত্তপ্রিয় সেখানেই মারা যান, অপর তিনজন ভীষণভাবে আহত হয়ে ধরা পড়েন। ক'দিন পরে হাসপাতালে বাঘা-যতীনের মৃত্যু হয়, নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়, জ্যোতিষের দ্বীপান্তর হয়—পরে পাগল হয়ে তিনি পাগলা-গারদে মারা যান। এই যুদ্ধ হয় ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

ওদিকে বাটাভিয়ায় যাওয়ার পর নরেন ভট্চাযের আর কোন খবর নেই তাঁর খবর নেবার জন্যে বেরিয়ে ভোলানাথ চাটুয্যে ওলন্দাজদের গোয়াদেশে গিয়ে গ্রেপ্তার হন, এবং তাঁর কারাদণ্ড হয়। ১৯১৬ সালের ২৭ জানুয়ারি পুনা জেলে তিনি আত্মহত্যা করেন। ওদিকে জার্মান জাহাজে চড়ে নরেন ভট্চায আমেরিকায় যান, সেখানে গিয়ে তিনি বন্দী হন। জার্মান-ভারত ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। ভারতে অস্ত্র নিয়ে আসবার পথে জার্মানদের 'অ্যানি লার্সেন' জাহাজ আমেরিকানদের হাতে, আর 'হেন্‌রি এস' জাহাজ ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে যায়। জার্মানীর সাহায্যে ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে, ভারতের বড়লাট হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন হাতির পিঠে চড়ে জমকালো শোভাযাত্রা করে রাজধানী দিল্লীর পথ দিয়ে

চলেছেন তখন চাঁদনিচকে এক বোমা পড়ল সেই হাতির হাওদায়। হার্ডিঞ্জ ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন, তাঁর একজন আর্দালী মারা গেল। সন্দেহ করে পুলিস আউধীবিহারী আর আমীরচাঁদ নামে দু'জন সম্পূর্ণ নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করল এবং ইংরেজের আদালতের বিচারে তাদের ফাঁসিও হয়ে গেল। বালমুকুন্দ আর বসন্ত দাস নামে দু'জনেরও একই অপরাধে ফাঁসি হল, তাঁরা অবশ্য সত্যই এ ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ ঘটনাব মূল আসামী রাসবিহারী বসুকে পুলিস ধরতে পারল না।

রাসবিহারী পালিয়ে এলেন কাশীতে, সেখানে শচীন সান্যালের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন। ১৯১৫ সালে শচীন ও রাসবিহারী লাহোরে গেলেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করার দিন ঠিক করলেন। কিন্তু পুলিস এ তোড়জোড় ধরে ফেলল। সহকর্মী বিষ্ণুগণেশ পিংলের সঙ্গে রাসবিহারী কাশীতে পালিয়ে এলেন। কিছুদিন পরে মীরাটের সৈন্যবারাকে পিংলে বোমা সমেত ধরা পড়লেন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। শচীন সান্যালও ধরা পড়লেন এবং তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। কিন্তু রাসবিহারী বসু ভারত থেকে চিরবিদায় নিলেন। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান, তাঁর আত্মীয় হিসেবে পি. এন. ঠাকুর নাম নিয়ে রাসবিহারীও সেই সঙ্গে জাপানে চলে যান। বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়ে ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

এর পর ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থামল। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার আশ্বাস পেয়ে মহাত্মা গান্ধী সে যুদ্ধে ইংরেজকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর স্বাধীনতা দেওয়া দূরের কথা, ইংরেজরাজ বজ্রশাসনের কঠোর দমনে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে রাউলাট আইন করল। সারা ভারত এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তুলল, কিন্তু সমস্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে সরকারি সদস্যদের

ভোটের জোরে বৃটিশ শাসক রাউলাট আইন পাস করিয়ে নিল। এই অত্যাচারী আইনের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে বিক্ষোভ দেখা দিল সবচেয়ে গুরুতর আকারে। আন্দোলন পরিচালনার অপরাধে গভর্নমেণ্ট পাঞ্জাবের নেতা ডাক্তার কিচ্‌লু আর ডাক্তার সত্যপালকে গ্রেপ্তার করল। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ওই বছরের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন বিরাট এক জনসভা হচ্ছিল, তখন সেখানকার বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে সৈন্যেরা সেই সভার ওপর অজস্র গুলিবর্ষণ করে। ফলে চারশ লোক সেখানে মারা যায়, দুহাজার লোক ভয়ানক ভাবে জখম হয়; যেসব লোককে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে একান্ন জনের ফাঁসি হয় আর ছচল্লিশ জনের হয় দ্বীপান্তর।

এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বৃটিশের দেওয়া 'স্যার' ( নাইট ) উপাধি ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী ইংরেজের এই বিশ্বাসঘাতকতা আর নৃশংসতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন এবং ইংরেজের সঙ্গে ভারতের অসহযোগ ঘোষণা করলেন—অর্থাৎ ইংরেজের কোন কাজেই ভারত কোন সাহায্য করবে না। সমস্ত দেশ অসহযোগ আন্দোলনে মেতে উঠল। গান্ধীজির সংগ্রাম হল 'অহিংস সত্যাগ্রহ'। কিন্তু চৌরিচরা নামক এক জায়গায় সত্যাগ্রহের সময় পুলিসের অত্যাচারে খেপে গিযে সত্যাগ্রহীরা অহিংসনীতি বিসর্জন দিয়ে সেখানকার থানায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং একজন দারোগা আর একুশজন কনেস্টবলকে পুড়িয়ে মারে। গান্ধীজি দেখলেন, দেশ তাঁর অহিংসা-নীতি পালনের উপযুক্ত হয়নি, সুতরাং অসহযোগ চালাতে গেলে তারা হিংসাবিপ্লব চালাবে, তাই তিনি তাঁর অসহযোগ ঘোষণা তুলে নিলেন।

বঙ্গভঙ্গের সময় দেশ কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়েছিল, অসহযোগী গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত সেই কংগ্রেসের পতাকাতলে দেশবাসী আবার সমবেত হতে লাগল। কিন্তু গান্ধীজি অসহযোগ প্রত্যাহার করায় বিপ্লবীদল

আবার কাজে নেমে পড়ল। ১৯২৩ সালের ৩ আগস্ট কলিকাতার শাখারিটোল ডাকঘরে স্বদেশী ডাকাতে হানা দিল। কলিকাতায় পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের অত্যাচার তখন পুরাদমে চলছে জাতীয়তাবাদীদের ওপর। '২৪ সালের ১২ জানুআরি চৌরঙ্গিতে মিস্টার ডে নামে একজন লোক যখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা মনে করলেন বুঝি টেগার্ট যাচ্ছে। অমনি গোপীনাথ গুলি চালালেন। ডে মারা গেল। ধরা পড়ে গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। এ সময় কলিকাতায় আর ফরিদপুরে বিপ্লবীদের বোমার কারখানা আবিষ্কার হয় এবং চট্টগ্রামে বড় একটা স্বদেশী ডাকাতি হয়।

অমনি ইংরেজ সরকারের দমন আরম্ভ হয়ে গেল পুরোমাত্রায়। ১৯২৩ থেকে ২৪ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস প্রভৃতি বহু নায়ক ও দেশকর্মীকে আটক করা হল। ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে বেরিয়ে পড়ল এক বোমার কারখানা: এ সূত্রে এক মামলা হল, নয়জন যুবকের তাতে দণ্ড হল। এই দক্ষিণেশ্বর মামলার বন্দীরা ছিলেন আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলে। বাংলার গোয়েন্দা পুলিসবিভাগের কর্তা রায় বাহাদুর ভূপেন চাটুয্যে বিপ্লবীদের কাছ থেকে গোপন কথা ফাঁস করাবার চেষ্টায় অত্যাচার জুড়ে দিলে দক্ষিণেশ্বর বন্দীদের হাতে মারা যান। এ অপরাধে অনন্ত মিত্র আর প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসি আর কয়েকজনের দ্বীপান্তর হয়।

এর পরে কিছুদিন বাইরে বিপ্লবী কাজে কিছু ঢিলেমি দেখা যায়। এর কারণ, ভেতরে ভেতরে গোপনে বিপ্লবীদের চলছিল সংগঠন। অনুশীলন আর যুগান্তর দল ছাড়াও এ সময় নূতন করে গড়ে ওঠে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল, শ্রীসংঘ আর বেংগল ভলান্টিআর্স।

১৯২৯ সালে পুলিস হঠাৎ কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের এক বাড়িতে হানা দেয় এবং নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী আর রমেন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার

করে কিছু বোমা তৈরির নিয়মতালিকা প্রভৃতি হাত করে। এ সূত্রে পুলিস সতীশ পাকড়াশী, রমেন বিশ্বাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত আর নিরঞ্জন সেনকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে নিরঞ্জন আর সতীশের সাত বছর করে দ্বীপান্তর হল, সুধাংশু আর রমেনের হল পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রামে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ লোকনাথ বল প্রভৃতির নেতৃত্বে বিপ্লবী-দল সেখানকার সরকারি অস্ত্রশালা আক্রমণ করে এবং প্রহরীদের হত্যা করে রাইফেল, লুইস্‌গান, রিভলভার, গুলিগোলা প্রভৃতি লুঠ করে নিয়ে আসে। এ খবর যাতে সরকারি লোকে বাইরে পাঠাতে না পারে, আর বাইরে থেকে কোন সাহায্য পেতে না পারে, সেইজন্যে বিপ্লবীরা টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের লাইন কেটে দেন এবং দুই জায়গায় রেলপথ তুলে ফেলেন। এর পর বিপ্লবীদের বড় একদল চট্টগ্রামের বাইরে জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপন করে। ইংরেজের সৈন্যদল আর বিপ্লবীদলে যুদ্ধ হয়। অনেক সৈন্য মারা যায়, বিপ্লবীও মারা যান বারোজন। এদের মধ্যে লোকনাথের ভাই টেগরা বলের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। অনন্ত সিং নিজে ধরা দেন। চন্দননগরে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ আর আনন্দ গুপ্ত ধরা পড়েন। কিছুদিন পরে সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। বিচারে সূর্য সেন আর তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রাণদণ্ড হয়; গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল প্রভৃতি বারোজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়; অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রথমে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, পরে আপীলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ধরা পড়ার আগে সূর্য সেন যখন ধলঘাটের এক গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন, তাঁদের দলের কিশোরী সভ্যা প্রীতি ওয়াদ্দাদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ তাঁদের আক্রমণ করে। প্রীতির গুলিতে ক্যামেরণ মারা যায়, তার পুলিসদল পালিয়ে যায়। ১৯৩২ সালে প্রীতির অধীনে নির্মল

সেন সহ একদল বিপ্লবী চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর রেল-ক্লাব আক্রমণ করে। এতে সাহেবদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয় তাতে নির্মল সেনের মৃত্যু হয়; প্রীতি আহত হন এবং ধরা পড়ার ভয়ে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে প্রাণ দেন।

এ সময়ই একদিকে আরম্ভ হয় মহাত্মাজির আইন-অমান্য আন্দোলনে লবণ-সত্যাগ্রহ, অন্যদিকে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয় বিপ্লবের রুদ্রলীলা। ঢাকায় পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করলেন বিনয় বসু। সেখানকার পুলিস-সুপার হড্‌সনের উপর আক্রমণ হয়। ঢাকার গোয়েন্দা-বিভাগের কর্ত্তা গ্রাসবিকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে বিনয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বাংলার পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল হলেন অতঃপর ক্রেইগ সাহেব। তাঁকে মারতে গিয়ে ভুল করে বিপ্লবীরা চাঁদপুরে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর তারিণী মুখুয্যেকে মেরে ফেলে। এ সূত্রে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয় আর কালী চক্রবর্তীর হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

কলিকাতার রাইটার্স বিল্‌ডিংএ ঢুকে দীনেশ গুপ্ত কারা-বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল সিমসনকে হত্যা করেন। দীনেশের সঙ্গে ছিলেন লোম্যান-হন্তা বিনয় বসু আর সুধীর গুপ্ত। ধরা পড়তে হবে নিশ্চয় জেনে বিনয় নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন আর সুধীর পটাসিয়াম সায়নাইড্‌ খেয়ে মরেন। দীনেশ গুপ্ত ধরা পড়েন, তাঁর ফাঁসি হয়; কলিকাতার কুখ্যাত পুলিস-কমিশনার টেগার্টকে বোমা ছুড়ে হত্যার একটা ব্যর্থ চেষ্টাও ডালহাউসি স্কোয়ারে এ সময়ে হয়।

মেদিনীপুরে একজন অত্যাচারী দারোগাকে হত্যা করে মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা হয়। এ সূত্রে চারজন লোকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। চট্টগ্রামে গোয়েন্দা পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর আহ্‌সান উল্লা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে ভীষণ অত্যাচার করতে থাকে। আহ্‌সান উল্লাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সূত্রে হরিপদ ভট্টাচার্য নামে একটি পনেরো বছরের কিশোরের

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ফরিদপুরের চরমুগুরিয়ায় ডাকলুঠের অপরাধে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করায় একজন পুলিসের লোক নিহত হয়; এ সূত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয় এবং সুরেন করের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯৩১ সালে কলিকাতার আর্মেনিআন স্ট্রীটে এক স্বদেশী ডাকাতি করার জন্য সুরেশ দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেই বছর সিনেট হল্‌এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণের সভায় বাংলার লাট স্ট্যানলি জ্যাকসন যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন বীণা দাশ তাঁকে গুলি করেন, কিন্তু জ্যাকসনের গায়ে গুলি লাগেনি। বীণা দাশের নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কুমিল্লায় শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী নামে দুটি কিশোরী সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্‌স্‌কে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করেন। শান্তি ও সুনীতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী যতীন দাস ছিলেন লাহোর কারাগারে। বন্দীদের ওপর কারাগারে যে-সব অত্যাচার হত তার প্রতিবাদে তিনি অনশন শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে খাদ্য গ্রহণ করাবার সকল রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বাষট্টি দিন উপবাসে কাটাবার পর ১৯৩১এর ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

স্টেট্‌স্‌ম্যান-পত্রিকার ভারতবিদ্বেষী সম্পাদক ওআট্‌সনকে ১৯৩২ সালে হত্যা করার চেষ্টা হয় দু-দু'বার। কুমিল্লার কালীগঞ্জে একজন গোয়েন্দা-পুলিসকে হত্যা করার চেষ্টা করায় বিরাজ দেবের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আসামের ইটাখোলা স্টেশনে ডাকাতি করার অপরাধেও তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়; শেষে দুই মামলায় মোট তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর কারাদণ্ড হয়।

জাতীয় আন্দোলনে বাংলাদেশে মেদিনীপুর এক বিশিষ্ট স্থান লাভ

করেছে। কাজেই পুলিসী অত্যাচারও সেখানে চিরদিন প্রচণ্ড। সেখানকার বিপ্লবীদের হাতে তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পর পর প্রাণ হারায়—তাদের নাম পেডি, ডগলাস ও বার্জ। অনাথ আর নৃগেন্দ্র নামে দুটি তরুণ ছাত্র বার্জকে হত্যা করে এবং সরকারি প্রহরীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ সূত্রে ব্রজ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় আর নির্মল ঘোষের ফাঁসি হয় এবং আর পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পেডি-হত্যার দায়ে পুলিস কাউকেই ধরতে পারেনি। ডগলাসকে হত্যার জন্যে প্রদ্যোত ঘোষের ফাঁসি হয়।

টেগার্ট হত্যাচেষ্টার বন্দী দীনেশ মজুমদার ছিলেন মেদিনীপুর জেলে এবং নলিনী দাস ছিলেন হিজলী জেলে। এরা দু'জনেই জেল থেকে পালিয়ে এসে কলিকাতার কর্ণওআলিস স্ট্রীটের এক বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। পুলিস খোঁজ পেয়ে ১৯৩৩ সালে একদিন সেই বাড়িতে হানা দিয়ে ঐ দু'জনকে এবং জগদানন্দ মুখুয্যে নামক আর-একজনকে গ্রেপ্তার করে। দীনেশের ফাসি হয়, নলিনী আর জগদানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

ভারতের সকল প্রদেশের যোগাযোগে আবার একটা বিপ্লবী সংগঠনের চেষ্টা হয়। পুলিস টের পেয়ে এ সূত্রে বত্রিশ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। কলিকাতায় এর মামলা হয়। তাতে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, জিতেন গুপ্ত ও সীতানাথ দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং আর সকলের সাত বছর করে কারাদণ্ড হয়।

এ বছরই দিনাজপুর জেলার হিলি স্টেশনে সরকারি ডাক-লুঠের অভিযোগে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, প্রফুল্ল সান্যাল আর সরোজ বসুর দশ বছর কারাদণ্ড এবং আর ক'জনের পাঁচ বছর হিসেবে কারাদণ্ড হয়। তারপর রংপুরে এক ডাকাতির ষড়যন্ত্রের জন্য হেম বক্সীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, আরও ক'জনের কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৪ সালে দিনাজপুরে ডাকাতি ও বিপ্লবী চেষ্টার জন্য নরেন ঘোষের

পনরো বছর আর দীনেশ দাসের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সে সময় বাংলার লাট ছিলেন অত্যাচারী এণ্ডারসন। ওই বছরই দার্জিলিংএর লেবংএ এণ্ডারসনকে গুলি করার জন্যে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয় এবং মনোরঞ্জন বাঁড়ুয্যে, মধু বাঁড়ুয্যে আর সুকুমার ঘোষের কারাদণ্ড হয়। চট্টগ্রামের বাথুয়াতে ডাকাতির জন্যে মোক্ষদা চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী এবং আরও ক'জনের কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৫ সালে টিটাগড়ে এক বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। সে সূত্রে বাইশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি আরও ক'জনের চার থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। ওই বছর ঢাকায় এক গুপ্তচরকে হত্যা করে অমূল্য রায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় একজন গুপ্তচরকে ছোরা মারার জন্যে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামে অমূল্য আচার্য একজন গোয়েন্দা পুলিসকে হত্যা করার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর দশ বছরের কারাদণ্ড হয়।

শেষের দিকে এসব ঘটনাতে দেখা যায়, দেশব্যাপী বিপ্লবী কাজের যেমন হিড়িক লেগে গিয়েছিল, শাসকের অত্যাচারও তেমনি বর্ব্বর নৃশংস অবিচারী হয়ে উঠেছিল। কতকটা এর ফলেও বটে, রাজনৈতিক অন্যান্য পরিবর্তনের ফলেও বটে, বাংলাদেশের হিংসবিপ্লব এর পরেই মন্দীভূত হয়ে ক্রমে থেমে যায়। দীর্ঘদিন পরে ১৯৪২এর আগস্ট-বিপ্লব সারা ভারতে জাগ্রত-জনবিক্ষোভের যে আগুন জ্বলে ওঠে, বাংলা চিরদিনের মতই তাতে আপন ভূমিকা গ্রহণ করেছে ; মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ একটি অঞ্চল কিছুদিনের জন্য সে বিদ্রোহে বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাতে পেরেছিল। কিন্তু সেদিনে গণযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী বিদ্রোহ-কাহিনীগুলো একটু আলাদা রকমের, তাই এখানে তার আলোচনায় বিরত থাকা গেল।

অধীনতার অন্ধসমুদ্র পেরিয়ে যে পথে আমাদের স্বাধীনতা এল, তার নিচে সেতুবন্ধ হয়েছে বিপ্লবীদলের দুঃখব্রতে, ত্যাগে, শৌর্যে, শোণিতনিষেকে। আজকের স্বাধীন ভারতের অধিবাসী আমরা তাঁদের উদ্দেশে প্রণতি জানাই, দেশের স্বাধীনতায় মাগি অজস্র শহীদের আশীর্বাদ।

জয় হিন্দ!

---

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘ মাস। কনকনে শীত পড়েছে কলকাতায়। কিন্তু সেদিন ভোর হতে না হতেই সকলে উঠে পড়েছে। মুখ-হাত ধুয়ে হাতে হাতে তেরঙা পতাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সব । রাস্তায় বেরিয়ে সামরিক কায়দায় পা ফেলে ফেলে গান ধরল—

“কদম কদম বঢ়ায়ে যা
খুসীকে গীত গায়ে যা।
য়হ জিন্দ্‌গী হৈ কৌম কী
( তো ) কৌম পর লুটায়ে যা।
জয় হিন্দ্............”

ছেলেমেয়েদের কলকল্লোল ও তরুণের তূর্য্যকণ্ঠের সঙ্গে যুবা-প্রৌঢ়ের দৃঢ়-কণ্ঠ এক হয়ে জয়ধ্বনি তুলল, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি জয়!" সেদিন তারিখ ছিল ২৩শে জানুয়ারী। কলকাতার আকাশে সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে নবীন ভারতের দেদীপ্যমান ভাস্করের বন্দনা তোমরা ভোলনি নিশ্চয়ই।

চিত্তরঞ্জন তাঁর দেশসেবায় দেশবাসীর কাছে নাম পেয়েছেন 'দেশবন্ধু', যতীন্দ্রমোহন পেয়েছেন 'দেশপ্রিয়', শাসমল পেয়েছিলেন 'দেশপ্রাণ', আর সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন 'দেশগৌরব'। দেশবাসী কি জানত যে সুভাষের কৃতিত্বে তাদের দেওয়া নাম লুপ্ত হয়ে আর একটি অমর নামের হবে প্রতিষ্ঠা!

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র দেশসেবার অপরাধে ইংরেজের বিচারে তখন কলকাতায় তাঁর নিজেরই ভবনে বন্দী। বাড়ির চারদিকে কড়া পাহারা—বন্দী যেন পালাতে না পারে।

তার আগে তিনি বন্দী ছিলেন আলিপুর জেলে। তাঁর স্বাস্থ্য পড়েছে ভেঙে। বন্দিত্বের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন শুরু করে দিলেন। বৃটিশ-সরকার তখন কারাগার থেকে নিয়ে এসে সুভাষকে বন্দী করল তাঁর নিজ বাড়িতে।

আলিপুর জেলে থাকতে থাকতেই সুভাষ হঠাৎ দাড়ি রাখতে আরম্ভ করলেন। বাড়িতে এসে তিনি যেন একেবারে আত্মস্থ হয়ে গেলেন। লোকের সঙ্গে খুব কমই কথা বলেন। সকলে বলতে লাগল, সুভাষচন্দ্র আবার সেই প্রথম জীবনের মত ধর্ম্মচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবসে কলকাতার লোক শুনে বিস্মিত হল যে, সরকারের কড়া পাহারাকে তুচ্ছ করে সুভাষ অন্তর্দ্ধান করেছেন। তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে দেশবাসী মর্ম্মাহত হল তাঁদের প্রিয় নেতা দূরে চলে গেলেন বলে। সরকারী মহলে বিষম চাঞ্চল্য দেখা গেল। বহু চেষ্টাতেও পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর কোন হদিস করতে পারলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে

তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোকের নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

মুক্তির অদম্য প্রেরণা যখন দেশপ্রেমিককে চঞ্চল করে তোলে, তখন শাসকের শতবন্ধনও তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। বৃটিশরাজের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এবং রক্ষীরাও তাই সুভাষের পথ আটকাতে পারেনি। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তাঁর অন্তর্দ্ধানের কাহিনী প্রচারিত হলেও তিনি তার সাতদিন পূর্ব্বেই কলকাতা ছেড়ে যান। ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু মোটরে করে তাঁকে :গোমো স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসেন। দীর্ঘচুল ও দাড়িতে তিনি পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ নিয়ে দুর্গমপথে যাত্রা করেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের শপথ নিয়ে। গোমো থেকে পেশোয়ারে গিয়ে তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করে কাবুলে পৌঁছান। কাবুলে তিনি লালা উত্তমচাঁদ নামক এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাবুলে এসে প্রথমে তিনি রুশ দুতের সঙ্গে কথা বলে মস্কো যেতে চাইলেন। তাতে ব্যর্থকাম হয়ে ইতালীর দুতের সাহায্যে তিনি মস্কো হয়ে বার্লিনে পৌঁছান।

এই সময় বিশ্বরাজনীতির দুইটি বিরাট ঘটনা সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মপন্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রাশিয়া আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে রুশ-জার্ম্মান মৈত্রী ছিন্ন হয় এবং বৃটেনের সঙ্গে রাশিযার মৈত্রী সম্পর্কের সূচনা হয়। সুভাষচন্দ্রকেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুশিয়ার সাহায্যের আশা ছাড়তে হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান কর্ত্তৃক অকস্মাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন ও বৃটিশ এলাকা আক্রমণ। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জাপান যে ভাবে দ্রুত সাফল্য লাভ করতে থাকে, তাতে বিশ্বের লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, প্রাচ্যভূমিতে জাপানের জয় অনিবার্য্য। জার্ম্মান আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় রাশিয়াও তখন টলে উঠেছে। সুভাষচন্দ্র তাই বৃটিশের বিরুদ্ধে চক্রশক্তির সাহায্যই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন।

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে উপনীত হন। সামরিক দিক দিয়ে আত্মপ্রস্তুতির জন্য তিনি রণবিজ্ঞান শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। হিটলার তাঁকে এ বিষয়ে সকল প্রকার সুযোগ দেন। বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করে এবং জার্ম্মান সেনাপতিদের কাছে রণনীতির শিক্ষা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত যখন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলেছে, প্রবাসে বসে সুভাষচন্দ্র তখন ফ্রিস্-ইণ্ডিয়েন বা স্বাধীন ভারত-বাহিনীর পত্তন করলেন। দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভের ফলে যে সকল ভারতীয় যুবক জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়াতে আটক হয়ে পড়েন এবং জার্ম্মানীর হাতে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হন, তাদের নিয়েই প্রথমতঃ তিনি এই বাহিনী গঠন করেন।

ইউরোপ ও আফ্রিকায় তখন জার্ম্মানীর অভিযান চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। বিজয়ী জার্ম্মান বাহিনী মস্কোর দ্বারে সমুপস্থিত। আফ্রিকাতেও রোমেল মিত্র বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করে চলেছেন। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন চক্রশক্তি হয়ত শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে ভারত-সীমান্তে উপনীত হবে। আর তাঁর সুশিক্ষিত সেনাদল সেই সুযোগে দেশকে স্বাধীন করতে পারবে। প্রায় ২৮ হাজার ভারতীয় সৈন্য স্বাধীন ভারত-বাহিনীতে যোগ দেয়।

জার্ম্মান সেনানায়কগণ এই সকল সৈন্যকে আধুনিক রণ-কৌশল শিক্ষা দেন এবং হিটলার এই বাহিনীকে জার্ম্মানবাহিনীর সমান মর্য্যাদা দেন।

জার্ম্মানীর ন্যায় ইতালীতেও একটি আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে ওঠে। তারা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে—"আমার দেশের এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে সাক্ষ্য রেখে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভারত-মাতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য আমি মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কায়মনো-বাক্যে সংগ্রাম করব।" ইতালীয় সেনাপতিদের সঙ্গে ইতালীয় আজাদ হিন্দ সেনানায়কদের মনান্তর ঘটায় তাঁরা আজাদ হিন্দ-বাহিনী ভেঙে দেন।

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী থেকে বেতারে ভারতবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। তিনি ভারতবাসীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বললেন। সুভাষচন্দ্রের প্রচারের ফলে যাতে দেশে কোন গোলমাল না হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। ভারতবাসীদের চিত্ত জয় করবার জন্য তাঁরা স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠালেন একটা মামুলী শাসন সংস্কারের ফরমূলা দিয়ে। ভারতের নেতারা যাতে এই ফরমূলা গ্রহণ না করেন, সুভাষচন্দ্র তজ্জন্য প্রচাব চালাতে লাগলেন। তিনি মালয় ও ব্রহ্মবাসীদের দুর্গতির দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যাহোক ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের দৌত্য সফল হয়নি। ভারতের নেতৃবৃন্দ যেদিন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, সুভাষচন্দ্র সেদিন পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে যে গণবিপ্লব শুরু হয, সুভাষচন্দ্র তজ্জন্য ভারতের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বেতাবে তিনি আগষ্ট বিপ্লবের নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াতে এসেও তিনি এই যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ভারতে কয়েকজন চর পাঠান। কিন্তু ভারতে অবতরণের পূর্ব্বেই তারা ধরা পড়ে। এই ভাবে আগষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। তারপর সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াস্থ ভারতবাসীদের আহ্বানে চলে আসেন মালয়ে। ইউরোপে তখন ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের মোড় ফিরে গেছে রাশিয়ার অনুকূলে। তাই ইউরোপ থেকে মধ্য প্রাচ্য হয়ে ভারত-সীমান্তে আসবাব স্বপ্ন বিসর্জ্জন দিয়ে এলেন তিনি এসিয়ায়।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলেন। যেন নূতন সূর্য্যোদয় হল। সমস্ত মালয় নবারুণের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এইখানেই আরম্ভ হয় সুভাষচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর অধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য এইখানে তিনি যে

বিরাট আয়োজন করেছিলেন, ইতিহাসে তার জোড়া মিলে না। কি গভীর আত্মশিক্ষা ও দেশপ্রেম নিয়ে তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেমেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরাধীন জাতির সৌভাগ্য এই যে, মাঝে মাঝে তাদেব মধ্যে এমন এক একজন লোকের আবির্ভাব ঘটে যিনি নিয়ে আসেন অফুরন্ত প্রাণশক্তি, আর সেই শক্তি সঞ্চারিত করেন সমগ্র জাতির হৃদয়ে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব্ব সংগঠন-শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার মাটিতে গড়ে তুললে এক বিশাল বাহিনী। ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও জাপানেব ভারতবাসীদের সমবেত করলেন তিনি উদাত্ত আহ্বানে। গড়ে উঠল স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী, নারী বাহিনী, কিশোর সেনাদল—যেন রূপকথা, যেন স্বপ্ন! হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল ছুটে এল এই আত্মভোলা, মুক্তিপাগল লোকটির ডাকে। সমবেতকণ্ঠে তারা তাঁকে জানাল—"নেতাজী, হুকুম করো।" উত্তর এল—"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো।"

নেতাজীর এই আহ্বানে তাদের রক্তে লাগল মুক্তির নাচন। দলে দলে এগিয়ে চলল তারা ভারত-সীমান্তে আক্রমণ হানতে—'ঊষার দুয়ারে আঘাত হেনে' তারা আনতে ছুটল 'রাঙা প্রভাত'। কণ্ঠে কণ্ঠে সমর-সঙ্গীত ধ্বনিত হল ভৈরব-মন্দ্রে। আকাশ বাতাস মুখরিত হল—'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' গানের সম্মোহন সুরে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও প্রবাসী ভারতীয়দের অস্ত্রবলে দেশোদ্ধারের প্রয়াস ১৯৪২ সালে প্রথম হলেও অনেক আগে থেকেই পূর্ব্ব-এসিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পত্তন হয়েছিল। যে সকল ভারত-সন্তান চীন, জাপান ও পূর্ব্ব-এসিয়ার অন্যান্য দেশে বসবাস করতেন, তাঁরাই এই আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এই আন্দোলন আরম্ভ করাব মূলে ভারতের কয়েকটি বিপ্লবী-বীর সন্তানের চেষ্টা ও সাধনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ দের

মধ্যে রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, আনন্দমোহন সহায় ও স্বামী সত্যানন্দপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাসমরের সূচনায় তাঁরা তাঁদের স্বপ্নকে রূপায়িত করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। এ সুযোগ এল মহাবল বৃটিশরাজের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর দিনটিকে ইংরাজ কোন দিন ভুলিতে পারবে না। মিত্রপক্ষের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে জাপান হানলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আকস্মিক আঘাত। মিত্রশক্তি-অধিকৃত দ্বীপগুলি অনায়াসে জাপান করায়ত্ত করলে। জাপান সেদিন বিশ্বের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশের তথাকথিত দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরের পতন হল। বৃটেনের সামরিক বাহিনী এই সময় শোচনীয় পশ্চাদপসরণ রণনীতি অবলম্বন করে। উভরড়ে পলায়ন করতে থাকে তারা। কে মরল বা কে বাঁচল তা দেখবার প্রয়োজনও সেদিন বৃটিশ কর্ত্তারা বোধ করেননি। মালয়ের ত্রিশ লক্ষাধিক ভারতীয়কে তাদের ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ সমরনায়কগণ পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

এর ফলে সর্ব্বত্র ভারতীয়দের মনে প্রবল আতঙ্কের সঞ্চার হল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হতে থাকল। মালয়ের ভারতীয়দের সে কি দুর্দ্দশার দিন! তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। চারদিকে লুঠতরাজ, সকলেই সর্ব্বহারা। বর্ম্মার ভারতীয়দের অধিকাংশও তখন দেশে ফেরবার চেষ্টায় রত। প্রবাসের সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে তারা দেশে ফিরতে উদ্যত। তার মধ্যে বাঙালী ও মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। পথে প্রান্তরে কত লোক যে সেদিন প্রাণ হারাল তার সংবাদ কে রাখে!

ভারতীয়গণ যে ইংরাজদের উপর সন্তুষ্ট নয়, ভারত থেকে যে তারা ইংরাজদের বিতাড়িত করতে চায়, জাপানীরা জানত। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও তাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তা'ছাড়া তারা "এসিয়া কেবল এসিয়াবাসীদের জন্য" এই রব তুলে বিজিত দেশের অধিবাসীদের

মনোজয়ের চেষ্টা করে। মালয়ে ভারতীয়দের দুরবস্থা দেখে তারা তাদের নিজের কাজে লাগাবার মতলবে উদার ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করলে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে ইংরাজরা আত্মসমর্পণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈন্যদের ফেরার পার্কে সমবেত করা হল। বৃটিশ সেনানী কর্নেল হাণ্ট তাদের জাপ সামরিক প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারার হাতে সমর্পণ করলে। মেজর ফুজিয়ারা ঘোষণা করলেন, "জাপান পূর্ব্ব-এসিযার সমস্ত জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পূর্ব্ব-এসিয়াকে নিরাপদ রাখতে হলে ভারতের স্বাধীন হওয়া দরকার। জাপ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনারা ভারতবাসী, দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করা আপনাদেরই কর্ত্তব্য। আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের হাতে সমর্পণ করছি। তিনিই আপনাদের নেতা। এখন থেকে আপনারা তাঁরই নির্দ্দেশ মেনে চলবেন।"

ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানীদের এই সহায়তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন। তিনি বললেন, "ভারতকে স্বাধীন করবার একটা মস্ত সুযোগ আমরা পাচ্ছি। আমরা একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করে এই কাজে আত্মনিয়োগ করব।"

এর প্রায় তিন সপ্তাহ পর ৯ই মার্চ্চ ও ১০ই মার্চ্চ মালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সিঙ্গাপুরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাপানের সহযোগিতার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। টোকিও থেকে রাসবিহারী বসু সংবাদ পাঠালেন যে, টোকিওতে ভারতীয়দের একটা সম্মেলন করে তাতে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভাল। সিঙ্গাপুর সম্মেলনও সেই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তদনুযায়ী ২৮শে থেকে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত টোকিওতে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয়দের এক সম্মেলন হয়। রাসবিহারী বসু এতে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে স্থির হয় যে, পূর্ব্ব-এসিয়ায় পূর্ণোদ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠন করা হোক এবং

সামরিক প্রস্তুতির জন্য গঠন করা হোক স্বাধীন ভারত-বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। ঘোষণা করা হল যে, এই আন্দোলনে কোন বিদেশী শক্তিরই হাত থাকবে না। কেবল মাত্র ভারতীয়দের নিয়েই স্বাধীন ভারত-বাহিনী গঠিত হবে। ভারতীয় সেনানীরাই করবে তার পরিচালনা, আর ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান করবে তারাই। ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার সমস্ত ভারতীয়-দের প্রতিনিধি নিয়ে আর এক সম্মেলন ডাকা হয়। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন এই সম্মেলন বসে। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু। ন' দিন ধরে চলে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হল ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই। সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু, সামরিক সদস্য হলেন কর্ণেল মোহনসিং, কর্ণেল গিলানি ও কর্ণেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলা। অসামরিক সদস্য হলেন মিঃ মেনন, মিঃ রাঘবন ও মিঃ গুহ। ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের উপরই জাতীয় বাহিনী গঠনের ভার পড়ল। তিনিই হলেন বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক। হাতের কাছেই যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ছিল। তাদের নিয়েই আরম্ভ হল কাজ। দেখতে দেখতে বহু অসামরিকও ভারতীয় সেনাদলে যোগ দিলেন। এই ভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ওঠে।

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ বেশী দূরে এগোতে না এগোতে জাপ-সামরিক কর্ত্তাদের হস্তক্ষেপের ফলে ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়। জাপানীরা মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করে। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। রাসবিহারী জাপান থেকে ছুটে আসেন। তিনি জাপ সেনানায়কদের দ্বারা দীর্ঘ পরামর্শ করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নূতন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর উৎসাহ

দেখা গেল না। ভারতীয়গণ জাপানীদের মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সিঙ্গাপুরে পূর্ব্ব-এসিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আর একটা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে রাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধেও একটা চাপা অসন্তোষ দেখা যায়। তিনি বুঝলেন যে, এদের একত্রে বেঁধে রাখতে হলে একমাত্র সম্মোহন মন্ত্র হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের নাম। এই সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র শীঘ্রই সিঙ্গাপুরে আসবেন এবং তিনি এলে সমস্ত ভার তাঁর হাতেই দেওয়া হবে। এ সংবাদে সকলেই উল্লসিত হলেন।

ভারত-ত্যাগের মত সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ-ত্যাগ একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। অতলান্তিক মহাসাগরের আকাশে ও জলে তখন মিত্রপক্ষের আধিপত্য। চক্রশক্তি তখন বিমান শক্তিতে হটে এসেছে। এমনই একদিনে মালয়ের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিন যোগে পাড়ি দিলেন। অতলান্তিকের একস্থানে সাবমেরিনটি ভুলক্রমে জলের উপর ভেসে উঠে। মিত্রপক্ষের বিমানগুলি তখন পিছু নেয়। আত্মরক্ষা করতে করতে সাবমেরিনটি কোন-ক্রমে সুমাত্রায় পেনাং বন্দরে উপস্থিত হয়। নেতাজী সেখান থেকে বিমান-যোগে টোকিও পৌঁছান ২০শে জুন। টোকিওতে জাপ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সিঙ্গাপুরে যান ২রা জুলাই তারিখে।

সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে যেন প্রাণ-সঞ্চার হল। সকলেরই মধ্যে একটা আশার ভাব, সমগ্র মালয় যেন নূতন সূর্য্যের আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠল! ৪ঠা জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক সভা হল সিঙ্গাপুরে। এই সভায় রাসবিহারী বসু সঙ্ঘের সভাপতিপদ ত্যাগ করলেন। সঙ্ঘের সভাপতিপদ গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র। পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট সমাবেশে তিনি স্বাধীন ভারতবাহিনীকে নবভাবে

সংগঠনের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি এই সভায় বলেন—"ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিকগণ, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন। ভগবান্ আজ আমাকে বিশ্বের সমক্ষে ভারতের মুক্তিবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করবার সুযোগ দিয়েছেন। যে সিঙ্গাপুর ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা প্রধান দুর্গ, সেই সিঙ্গাপুরের বুকের উপর রণসজ্জায় দাঁড়িয়ে আছে ভারতের মুক্তি-সেনা। এই সেনাদলই ভারতকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করবে। বন্ধুগণ, তোমাদের রণহুঙ্কার হোক, 'চল দিল্লী, দিল্লী চল।' জানি না যুদ্ধশেষে তোমাদের মধ্যে কতজন বেঁচে থাকবে। তবে একথা ঠিক, যুদ্ধে জয় হবে আমাদেরই। দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়ী বীরের বেশে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত তোমাদের কাজ শেষ হবে না। সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে, জয়ে-পরাজয়ে সর্ব্বদা আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকব।"

এরপর থেকে স্বাধীনতা সঙ্ঘের কাজ চলতে থাকে বেশ ভাল ভাবেই। ফৌজ গঠনও চলে দ্রুততালে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকলেই দলে দলে যোগ দিতে থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নামে রেজিমেণ্ট গঠিত হয়।

পূর্ব্ব-এসিয়ার নারীরাও নীরব ছিলেন না। তাঁরাও দলে দলে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সদস্যা হলেন। এঁদের নিয়ে আরম্ভ হল নারীবাহিনী গঠনের কাজ।

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারত-ত্যাগের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের ভিতরের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাইর থেকে বৃটিশ শক্তির উপর আঘাত হেনে ভারতকে স্বাধীন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য তিনি তিনলক্ষ সৈন্য ও তিন কোটী ডলার সংগ্রহের এক আবেদন জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কেবল পুরুষদের নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হবে না। তিনি ভারতীয় নারীদের নিয়ে এক মৃত্যুভয়হীন দুর্ব্বার নারীবাহিনী গড়ে তুলতে চান। ১৮৫৭ সালে ভারতের

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়িকা ঝাঁসীর রাণীর মতই এরা নির্ভয়ে অস্ত্র চালনা করবেন।

অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কাজ চলতে লাগল। চারদিকেই সাজ সাজ রব। ১৯৪৩ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে উদ্দেশ করে বলেন—"অনাবিল জাতীয়তাবোধ, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার উপরই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। আমি সেই ভাবেই কাজ করব। সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চলতে হবে আমাদের। ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য—আমাদের পণ, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' পৃথিবীতে আজ এমন কোন শক্তি নাই যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে। কাজ আমাদের সুরু হয়ে গেছে। 'দিল্লী চল' রণহুঙ্কারে আমরা যাত্রা করি এস। দিল্লীর লাল কেল্লা জাতীয় পতাকায় শোভিত না হওয়া পর্য্যন্ত—লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃপ্ত বিজয়োৎসব না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিরাম নাই।"

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক মহান অধিবেশনে ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের কথা। প্রায় দশ-বারো হাজার লোকের এক বিরাট জনতার সমক্ষে শপথ গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিগণ কার্য্যভার গ্রহণ করলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সেই বিরাট জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন—"ভগবানের নামে আজ এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতের ও আমার ৩৮ কোটী দেশবাসীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করব। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরও আমি এই শপথ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দানে প্রস্তুত থাকব।"

আনন্দোন্মত্ত জনতা পূর্ব্ব-এসিয়ার দিগন্ত প্রকম্পিত করে চীৎকার করে উঠল—"সুভাষচন্দ্র বসু কি জয়!—আর্জ্জিহুকুমৎ আজাদ হিন্দ কি জয়!"

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হল এই ভাবে ঃ

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি।

লেঃ কর্ণেল এ. সি. চাটার্জি—অর্থসচিব।

এম. এ. আয়ার—প্রচারসচিব।

লেঃ কর্ণেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রবাহিনীর প্রতিনিধি—লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ, লেঃ কঃ এন এস্ ভগত, কর্ণেল জে. কে. ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজার সিং, লেঃ কঃ এম. জেড. কিয়ানী, লেঃ কর্ণেল এ. পি. লোকনাথন, লেঃ কঃ আহ্সান কাদির, কর্ণেল শাহনওয়াজ। এ. এম. সহায়—সেক্রেটারী (মন্ত্রীর সমমর্য্যাদাসম্পন্ন)। রাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা। পরামর্শদাতৃমণ্ডলী—করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েলাপ্পা, জে. থিবি, সর্দ্দার ঈশ্বরসিং। এ. এন. সরকার—আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ সরকারের উনিশটি বিভাগ সুচারুরূপে শাসনকাজ চালাতে থাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কাজও চলে পূর্ণোদ্যমে। এই সঙ্ঘের মালয়ে ৭০টি, ব্রহ্মদেশে ৮০টি, এবং শ্যামে ২৪টি শাখা ছিল। এ ছাড়া যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সেলিবিস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন, চীন, মাঞ্চুরিয়া ও জাপানেও সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখাগুলি আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ এবং সমাজ-সেবায় মনোনিবেশ করে। আজদ-হিন্দ সরকার স্বাধীন সরকারের সমস্ত কর্ত্তব্যই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে থাকে।

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার তৃতীয় দিবসে জাপ গবর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করেন। জাপ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণায় বলা হয়, "জাপ গবর্ণমেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গবর্ণ-

মেণ্টকে স্বীকার করছে এবং ঘোষণা করছে যে, এই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যথাশক্তি সাহায্য করবে।" এই দিনই আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আজাদ হিন্দ সরকার অতঃপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জার্ম্মানী, ইতালী, জাপান, শ্যাম, ফিলিপাইন, ক্রোসিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ব্রহ্মদেশ ও আয়ার্ল্যাণ্ড এই নয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

এদিকে সেনা সংগ্রহ ও তাদের শিক্ষাদান চলতে থাকে দ্রুতগতিতে। নয়টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ভারতীয় সেনানীরাই এদের শিক্ষার ভার নেন। শিক্ষাশিবিরগুলিতে এক সঙ্গে ৭ হাজার সৈন্যকে শিক্ষা দেওয়া হত। সেনানীদের জন্যও সিঙ্গাপুরে একটি ও পরে রেঙ্গুনে একটি শিক্ষাশিবির খোলা হয়। নারীবাহিনীর জন্য সিঙ্গাপুরে একটি ও রেঙ্গুনে দুটি শিক্ষাশিবির খোলা হয়। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাই আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা বলে গৃহীত হয়। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদিগকে দীক্ষিত করলেন 'জয় হিন্দ' মন্ত্রে। 'জয় হিন্দ' বলেই সকলে পরস্পরকে অভিবাদন করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে এই রীতি সমগ্র পূর্ব্ব-এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন এর সৈন্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার এবং সেনানীর সংখ্যা পনেরো শত। আজাদ হিন্দ ফৌজে পাঁচটি রেজিমেণ্ট ছিল: (১) সুভাষ রেজিমেণ্ট, (২) গান্ধী রেজিমেণ্ট, (৩) নেহেরু রেজিমেণ্ট, (৪) আজাদ রেজিমেণ্ট, (৫) ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্ট।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত আজ ভারতের ঘরে ঘরে গীত হয়— "কদম কদম বঢ়ায়ে যা" গানে রণযাত্রার একটা ঝঙ্কার বেজে উঠে যেন।

একটা স্বাধীন সরকার ও সেনাবাহিনী পরিচালনার ব্যয় বিরাট। সুভাষ-

চন্দ্রের আবেদনে ভারতীয়গণ মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় আট কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। বড় বড় ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন স্বেচ্ছায়। রেঙ্গুনে এক ব্যবসায়ী প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ব্রহ্মের জেয়াবাদী গ্রামের এক জমিদার কয়েক কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন। সভায় সুভাষচন্দ্রের গলার মালা বিক্রী করা হত। একলক্ষ, দু'লক্ষ, তিন লক্ষ, এমন কি বারো লক্ষ টাকা মূল্যে একখানা মালা বিক্রী হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীনতা দিবসে মালয়ের ভারতীয়গণ ৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে সুভাষচন্দ্রকে উপহার দেন। রেঙ্গুনের এক ক্রোড়পতি মুসলমান ব্যবসায়ীর সাহায্যে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ম্মায় এই ব্যাঙ্কের কয়েকটি শাখা খোলা হয়। এই ব্যাঙ্কে নেতাজী তহবিলের প্রায় কুড়ি কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আমানত বাবদ প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা জমা হয়। এই ভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হয়।

১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে আজাদ হিন্দ সরকারের রাজধানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়। সিঙ্গাপুর রইল পশ্চাদ্বর্ত্তী হেডকোয়ার্টার। নেতাজী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি; কিন্তু সাধারণ সৈনিকের মত তিনি সকলের সঙ্গে মিশেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালবাসা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয় হাজারো গুণে। নেতাজীর নেতৃত্বে যে তারা ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে সে বিষয়ে তারা দৃঢ় নিশ্চিত। আর আর সেনাপতিদের মধ্যে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, মেজর লেঃ জেনারেল ভোঁস্‌লা, কর্ণেল সেহ্‌গাল, মেজর ধীলন, ক্যাপ্টেন কিয়ানী প্রভৃতির নাম সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। নারীবাহিনীর অধিনায়িকা লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনও তাঁর বাহিনীকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই অভিযানের সেনাপত্য দেওয়া হয় মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের উপর। স্থির হল, আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরের রাজধানী ইম্‌ফল আক্রমণ করবে। তদনুযায়ী আসাম-ব্রহ্ম-সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের চারটি ব্রিগেড সমাবেশ করা হল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তারা ইম্‌ফল দখল করতে পারবে। সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছালে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং সেনাপত্য করবেন—এইরূপ স্থির হয়। মণিপুরে স্বাধীন ভারতবাহিনী হানা দিলে। একটা অভিযান চলল ইম্‌ফলের দিকে আর একটা কোহিমার দিকে। প্রথম অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে। তাদের মনোবল ও শৌর্য্যের সম্মুখে শত্রু-সেনাদল দাঁড়াতেই পারেনি। বীর গোরার দল কালা আদমী ভারতীয় সেনাদের সম্মুখে না এসে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে থাকে। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণ করে। ভারতভূমিতে এসে আজাদী সেনারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে দেশমাতাকে বন্দনা করে! সেনানায়ক শাহনওয়াজ ভারতের মাটিতে প্রথম জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্‌ফল-কোহিমা সড়কেরও একাংশ দখল করে। এই সময় বৃটিশ বাহিনীর অবস্থা অতি সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিমানের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের এই প্রাথমিক সাফল্য রক্ষা করতে পারে না। ৮ই এপ্রিলের মধ্যে তাদের হটে আসতে হয় কোহিমার উপকণ্ঠ থেকে। জাপ-বাহিনী রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রণসম্ভার বা প্রয়োজনীয় রসদ কোনটাই দিতে পারেনি।

আধুনিক অভিযানের শ্রেষ্ঠ বল বিমান-বল। বিমানের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজেদের অসহায় মনে করতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও তারা যে সংগ্রাম করে তাতে বৃটিশ ও মার্কিন সেনানায়কেরা অভিভূত

হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে মিত্র-বাহিনী বহু বিমান ও নূতন নূতন সৈন্যদল আমদানী করতে সমর্থ হয়। পাল্টা আক্রমণ করে তারা ২০শে জুনের মধ্যে সমগ্র আসাম পুনর্দখল করে।

ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল ভেঙে পড়েনি। নূতন ভাবে সংগঠন করে তারা পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এদিকে প্রবল বর্ষা সুরু হয়। মণিপুর অঞ্চলের প্রান্তরগুলি যেন এক একটি সমুদ্র। তদুপরি খাদ্য, পোষাক ও রণসম্ভারের অভাব। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনদিন রণে ভঙ্গ দেয়নি। কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধের পর জাপ-বাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজকেও বাধ্য হয়ে জাপ-বাহিনীর দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে হয়।

১৯৪৫ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখে মিত্রসেনারা মান্দালয় সহর সম্পূর্ণরূপে দখল করে রেঙ্গুনের দিকে এগিয়ে যায়। রেঙ্গুনের ৫০ মাইল উত্তরে জাপ বাহিনী শেষ সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্যও হতাশায় আত্মসমর্পণ করতে থাকে। তা সত্ত্বেও ফৌজের একটা অংশ দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলকে আশ্রয় করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু তারাও বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারলে না। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল লেঃ কর্ণেল সেহ্‌গাল আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ১৪ই মে কর্ণেল ধীলন ধৃত হন এবং ১৮ই মে তারিখে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ বন্দী হন।

সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র অভিযানের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক যুগের সর্ব্বাত্মক অভিযান চালাবার মত সঙ্গতি না নিয়েই তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, কোন রকমে ভারতে এসে পড়লে ভারতের লোক স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়নি। গোড়া থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। জাপানীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়া গেল ন। সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য, পোষাক ও রণসম্ভারের

অভাব দেখা দিল। তার উপর সুরু হল প্রবল বর্ষা। আসাম ও মণিপুরের এ অঞ্চল বেশি বর্ষাতে একেবারে দুর্গম হয়ে উঠল। ওদিকে বিমান-বলে বলীয়ান হয়ে মিত্র-বাহিনী হানতে থাকে প্রচণ্ড আক্রমণ। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে চাই বিমান—কিন্তু একখানা বিমানের সাহায্যও আজাদ হিন্দ ফৌজ পায়নি।

এ অভিযানে ব্যর্থতার একমাত্র কারণ বিমানের অভাব—আজাদ বাহিনীর মনোবল বা বাহুবলের অভাব নয়। শৌর্য্যে, বিক্রমে, ধৈর্য্যে ও নিয়ম-নিষ্ঠায় এই আজাদ বাহিনী নেতাজীর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। খাদ্য নেই, পোযাক নেই, পর্য্যাপ্ত সমরোপকরণ নেই—তা সত্ত্বেও খণ্ড খণ্ড সম্মুখযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা যে শৌর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়, স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষার ফলেই তা সম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে এদের এই বীরত্বের তুলনা নেই। স্থানাভাবে এই সমস্ত যুদ্ধের বিস্তারিত কাহিনী দেওয়া সম্ভবপর হল না।

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী ও কিশোর সেনার দলও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। এই দুই বাহিনীই যে কোন দেশের গৌরবময় বস্তু। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই দুই বাহিনীর কীর্ত্তি-কলাপ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ... ... ...

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুনস্থ জাপ সেনাপতি তাঁর দলবল নিয়ে ব্রহ্মের রাজধানী পরিত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। আসামের যুদ্ধে জাপানীদের ব্যবহারে তিনি খুব মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর স্বাধীন মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে জাপ কর্ত্তাদের সর্ব্বদাই বশ্যতা স্বীকার করতে হত বলে, তারাও তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। বহু ভাবে চেষ্টা করেও তাঁরা নেতাজীর উপর কোন দিন কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে

দিতে পারেন নি। ভারতের ব্যাপারে তিনি কোন বিদেশীর সর্দ্দারী সহ্য করতে পারতেন না।

১৯৪২ সালে জাপানীরা যখন বর্ম্মা দখল করে, তখন দেশে যে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, তাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে প্রাণ দিতে হয়। এবার যাতে বর্ম্মাতে সেরূপ কোন অরাজকতা দেখা না দেয়, সেজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সেনাদলের উপরে রেঙ্গুন রক্ষার ভার দিয়ে ২৪শে এপ্রিল তারিখে নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। যাবার আগে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে শেষ বাণী দিয়ে যান—"ইম্‌ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এ তো সবে সূচনা মাত্র। আমাদের আরও অনেক যুদ্ধ করতে হবে। চির আশাবাদী আমি, কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় স্বীকার করি না। ইম্‌ফলের উপত্যকায়, আরাকানের অরণ্যে, ব্রহ্মের তৈলখনি এলাকায় ও অন্যান্য স্থানে তোমাদের ধারাবাহিক সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।"

ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর ৬০ জন বীরাঙ্গনা ও প্রায় একশত সৈন্য নিয়ে বিঘ্নসঙ্কুল পথে সুভাষচন্দ্র ১৫ দিন পরে ব্যাঙ্ককে উপনীত হন। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের পরে মিত্রপক্ষের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে আজাদী সেনারা অস্ত্র ত্যাগ করে। যতদূর জানা যায়, ব্যাঙ্ককে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুই হাজার সৈন্য ছিল। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের চীফ-অব-ষ্টাফ জেনারেল জগন্নাথরাও ভোঁসলা বৃটিশের হাতে বন্দী হন। যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কি পরিমাণ সৈন্য ক্ষয় হয়েছে এখনও তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার আজাদী সেনা হতাহত হয়েছে।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে সরে আসবার পর থেকে নেতাজীর গতিবিধি

সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ১৯৪৫ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে জাপ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অকস্মাৎ সংবাদ দেয় যে, ১৮ই আগষ্ট তারিখে এক বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সারা ভারতের লোককে এই সংবাদ স্তম্ভিত করে দেয়। অতি আপনার জনকে হারানোর তীব্র ব্যথা অনুভব করে তারা অন্তরে অন্তরে এ সংবাদ বিশ্বাস করতে পারে না। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখেও আর একবার তো তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রটেছিল। সকলেরই আন্তরিক কামনা এ সংবাদ মিথ্যা হোক, প্রিয় নেতাজী আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন।

নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে প্রচারিত সংবাদে বলা হয়, ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনখানা বিমানে স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্টের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও জাপ সেনানীদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাত্রা করেন। পথে বিমানগুলি ফরমোজার তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে নামে। সুভাষ যে বিমানে ছিলেন আকাশে উঠলে সে বিমান বিকল হয়ে যায় এবং পাক খেতে খেতে বিমানখানা মাটিতে পড়ে। তাঁর দেহ এমন থেতো হয়ে যায় যে, তাঁর আর বাঁচবার কোন আশা ছিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাইহোকুর এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কর্ণেল হবিবুর রহমানও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন। তিনিও আহত হন, কিন্তু তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

কিন্তু এই বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কর্ণেল হবিবুর রহমানের নিজের মুখের কাহিনী, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশিষ্ট নেতাদের অভিমত ও নানা গুজব নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদের উপরে এমন একটা রহস্যের জাল বুনেছে যে, কোন দিন তা অপসারিত হবে কিনা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, তিনি চির-দিন দেশবাসীর অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন গত দুই শতাব্দীর মধ্যে দেশের মুক্তি-সাধক শ্রেষ্ঠ বীর নায়করূপে।

এদিকে ব্রহ্ম ও মালয় অধিকার করে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও সেনানীদের বন্দী করলেন। মালয়, ব্রহ্ম ও ভারতের

নানা বন্দীশালায় আটক করা হল তাঁদের। সরকারী বিবৃতিতে সাড়ে উনিশ হাজার আজাদী সৈন্যকে আটক করার কথা বলা হয়। তার মধ্যে এগার হাজার তিন শত সৈনিককে তদন্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়, আড়াই হাজার সৈনিককে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রধান প্রধান সেনানীদের বিচারের জন্য নয়টি সামরিক আদালত গঠন করা হয়। যে লাল কেল্লায় বিজয়ী বীরের বেশে তাঁদের আসবার কথা ছিল, সেই লাল কেল্লাতেই বসে তাঁদের বিচার-সভা। এই সমস্ত বিচারের সময় সমগ্র ভারতে প্রবল গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে এঁদের পক্ষ সমর্থন করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস-তরফ থেকে সাহায্য তহবিল খোলা হয়। ভারতের জনসাধারণ মুক্তহস্তে দান করে এই তহবিলে, বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় তারা অর্গের উপচারে। প্রবল গণমতের চাপে অধিকাংশ সেনানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেও, সরকার কয়েকজনের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

১৯৪৫ সালের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভারতের ভিতরে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন আজ তাকে স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত করেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটেন ভারতের হাতে ডোমিনিয়ান শাসনের অধিকার তুলে দিচ্ছে। এই দিন সারা ভারতে স্বাধীনতার উৎসব। আশা করি, ভারত সরকার এই দিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল সেনানীকে মুক্তি দিয়ে বীরের সম্মান করবেন।

নেতাজী, আজ তুমি কোথায় জানি না। তবে তোমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে এইটুকু জানি। যে লাল কেল্লায় তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমাবেশ করতে চেয়েছিলে, সেই লাল কেল্লা আজ ভাবতীয় বাহিনীরই হেড কোয়াটার হয়েছে। তবুও যেন আমরা সব কিছু পাইনি। পূর্ণ স্বাধীনতাই

ছিল তোমার লক্ষ্য। ডোমিনিয়ান শাসনের বিরুদ্ধে তোমার অস্ত্র ছিল সর্ব্বদাই উদ্যত। ভারতে আজ তোমার বড় প্রয়োজন—

'অবনত ভারত চাহে তোমারে—এস প্রহরণধারী নেতাজী!'

জয় হিন্দ্

---

**আজাদ হিন্দ ফৌজের রণ-সংগীত—**

কদম কদম বঢ়ায়ে যা,
খুশীকে গীত গায়ে যা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌম কী,
(তো) কৌম পর লুটায়ে যা॥

তুঁ শেরে-ই-হিন্দ আগে বঢ়,
মরণসে ফির ভী তুঁ ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে শির,
জোশে বতন বঢ়ায়ে যা॥

তেরী হিম্মৎ বাঢ়তী রহে,
খুদা তেরী সুনতা রহে।
যো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকসে মিলায়ে যা॥

চলো দিল্লী পুকারকে,
কৌম-ই নিশান সম্হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়্কে,
লহরায়ে যা, লহরায়ে যা॥

জয় হিন্দ্

---

**স্বদেশী গান**--

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান।
( তাই ) মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।

সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার,
কোটী পদাঘাত কোটী অবিচার,
তবু হাসিমুখ বলি বারবার—,
'সুখী কেবা আর মোদের সমান?'

শোষণে শূন্য কমলা ভাণ্ডার
গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার,
যে বলে একথা, অপরাধ তার,
হায় হায় একি কঠোর বিধান!

বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।

না জানি জননি! কতদিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার—
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ?   এদেশ তোদেব নয় ;—
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোদের ইহা হ'ত যদি
পরের পণ্যে, গোরাসৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মাভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ?   এদেশ তোদের নয় !
এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোদের ত নয় একটি ছড়া,
তোদের হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরুছে তোমার সপ্তগোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎভরা জয় !
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় ।
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ী,
এই যে থানা, জেহেলখানা—এই যে বিচারালয়,
লাট, ছোটলাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
আইন-কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ-সুবিধা তাদের ভারতময় ;
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চে, তাদের নাচে তোদের বলে ব্যয় ;
একশ' রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমরা কেবা,
গাধার কাছে বাঁধার বল, বাঘের কবে ভয় ?

* * *

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ, কানা-খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাংখা-কুলী—পীলা ফাটার ভয় ।
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয় ?

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
যাহার লাঠি তাহার মাটি চিরদিনের কথা খাঁটী,
এ ত নহে চা'র পেয়ালা, চুমুক দিলে জয় !

দেখলে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ঘুষির বদল খুসি করে—সেলাম মহাশয় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
সোনার বাংলা, সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে এই কি মনে লয় ?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয় !
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়।

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের ব্যাংকে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলী, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
কিসের বা তোর নেপাল, ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়।
ওই যে ওদের "কাটামুণ্ড", সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হাঁ করিয়ে রয় !

* * *

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে ? এদেশ তোদের নয় !
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ, কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ?
কোথায় সে ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য, অসীম ধৈর্য,
কই সে উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্যে বীর্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয় !
প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে,
কই বা তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয় ?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক, দর্শনে তার শত্রুকুলক্ষয় !

লোহার চেয়ে মহাশক্ত ভক্তবীরের মাংসরক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম আসি' তাইতে তারা দৈত্য নাশি'
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয় !
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

—গোবিন্দ দাস

———

# ক্রিপস্ প্রস্তাব থেকে পনেরোই আগষ্ট

শ্রীসুরেশ মৈত্রেয়

## সূচনা

বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা '৪৭ সালের এই প্রসন্ন প্রভাতকে নমস্কার জানাবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছি। সাম্‌নে পত্‌-পত্‌ করে উড়ছে আমাদের চক্রশোভিত নতুন জাতীয় পতাকা, নবলব্ধ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান সমস্ত জাতির ঐক্যতানে উদ্‌গীত হচ্ছে সেই মহামন্ত্র, 'বন্দে মাতরম্‌'। আজ ১৫ই আগষ্ট। আজকার এই উৎসব, এই আনন্দ, এই বিজয়ের উজ্জ্বলতা উত্তীর্ণ হয়ে একবার ফেলে আসা দিনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেখব? '৪২ সাল থেকে '৪৭ সাল পর্য্যন্ত—এই দীর্ঘ পথে রয়েছে বহু শহীদের রক্তাক্ত পদচিহ্ন। সরকারী পথ দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটলে যেমন চোখে পড়ে পথের দীর্ঘতা-পরিমাপক 'মাইল ষ্টোন', ভারতের মুক্তির পথেও ঐ পদচিহ্নগুলি একই কর্ত্তব্য পালন করে চলেছে। যাঁরা আমাদের বিজয়কে সম্ভব করেছেন, তাঁদের কথা আজ আমরা স্মরণ করব, তর্পণ করব

তাঁদের স্মৃতির। এরই সঙ্গে মনে রাখব ভারতের প্রত্যেকটি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের পিছনে রয়েছে আমাদের গতকালকার প্রভু বৃটিশ-সিংহের অত্যাচার আর কূট-কৌশল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যেকটি পর্ব্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্ব্বিনীত আঘাতেরই প্রতিঘাত!

## ক্রিপস্ প্রস্তাবের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স দেখতে দেখতে জার্ম্মানীর করতলগত হল। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভীরু মনে বড়লাট লিন্‌লিথগো ঘোষণা করলেন, আমি আমার শাসন পরিষদে ভারতীয়দের যথার্থ প্রতিনিধি নিতে রাজী আছি, আর যুদ্ধ চালান ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কমিটি বসাতেও প্রস্তুত। অথচ ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসেই রামগড় কংগ্রেসে নেতারা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে এক বিন্দু ছোট কোন প্রস্তাবে কংগ্রেস সম্মত হবে না। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদও তাঁরা দাবী করেছেন। গর্ব্বোদ্ধত চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার নোকর লর্ড লিনলিথগো তার উত্তর পর্য্যন্ত না দিয়ে দমন-নীতির নৃশংস রথ চালিয়ে দিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর একক সত্যাগ্রহের প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল; কারণ যুদ্ধে ব্যস্ত ইংরেজকে বিব্রত করতে গান্ধীজীর অমত ছিল।

একক সত্যাগ্রহের ফলে প্রথমে গ্রেপ্তার হলেন আচার্য্য বিনোবা ভাবে। জাতীয়তাবাদী ভারতের নিরলস সংগ্রাম তখন শক্তিসংগ্রহে ব্যস্ত। ভারতবর্ষের সেদিনকার ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের নিগড় ভেঙে ফেলবার উদ্যোগ-পর্ব্বের ইতিহাস। বোম্বাইএ শ্রমিকদের বিরাট ধর্ম্মঘট, মালাবারে কৃষকদের জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভ্যুত্থান; কায়ুরে চারজন কিষাণ-কর্ম্মীর ফাঁসিতে আত্মদান; কংগ্রেস সভাপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতির কারাগারে অবরোধ, আর ভারতের বাইরে হিটলার কর্ত্তৃক

সাম্যবাদের দেশ সোভিয়েট রাশিয়াকে অতর্কিতে আক্রমণ, জাপানের যুদ্ধাবতরণ—ক্রিপস্ সাহেবের ভারত আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই হল মোটামুটি তৎকালীন দেশের অবস্থা! ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রথমে বৃটিশ ও পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গর্ব্ব খর্ব্ব করে দিল। ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ ঘোষণা করে হংকং ও ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন মার্চ্চ মাসের মধ্যেই জাপানীরা অধিকার করলে।

## ক্রিপস্ প্রস্তাব ও তার ব্যর্থতা—

ঠিক এই সময়েই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ উদ্ধারে বিলাতের কূটনীতিবিশারদ দুঁদে ব্যারিষ্টার স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ২৩শে মার্চ্চ গালভরা হাসি আর শূন্য হাত নিয়ে ভারতের মাটিতে নামলেন। কাগজে কাগজে তাঁর হাস্যময় ছবি ঘটা করে প্রকাশিত হল। বৃটিশ-সিংহ তখন ডুবতে বসেছেন; অর্দ্ধেক ইউরোপ নাৎসীদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন। ডানকার্ক থেকে সাফল্য-জনক ভাবে পশ্চাদপসরণের গর্ব্বেই বৃটিশ সংবাদপত্র তখনও গর্ব্বিত। এদিকে এশিয়ায় জাপানীদের কাছে তাড়া খেয়ে বৃটিশ-সিংহ ধুকছে; কিন্তু তবু সে সগর্ব্বে বলছে যে, অতলান্তিক সনদ ভারতের উপর প্রয়োজ্য হবে না। অবশ্য ভারতকে খোসামোদ করা তার জন্য বাদ গেল না। ভারতের নেতারা নাৎসীশাসিত জার্ম্মানী এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপ আক্রমণে বিব্রত সোভিয়েট ও মহাচীনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন প্রথম থেকেই; কারণ তাঁদের দেশপ্রেম শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই কোনরকম অত্যাচারমূলক অভিযানের পশ্চাতে তাঁদের সমর্থন ছিল না। মহাচীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করেছিল। বৃটিশ সরকার এই সুযোগ সদ্ব্যবহারের আশা পোষণ করেই ভারতে বিশেষ বার্ত্তাবহ প্রেরণ করলেন। কয়েকদিন ক্রমাগত আলাপ-আলোচনার পর বৃটিশ প্রস্তাব গ্রহণে কংগ্রেস তার অক্ষমতা জানিয়ে দিল। সেই গালভরা-হাসি আর শূন্য হাত নিয়ে ক্রিপস্ বিলেত চলে গেলেন।

ভারতসচিব এমেরী বিশ্বময় গেয়ে বেড়াতে লাগলেন, ভারতীয়রা নিজেদের বোকামীর জন্যই স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হবার আর একটি সুবর্ণ সুযোগ হারাল। বিলেতে যেয়ে ভালোমানুষ এবং ভারতহিতৈষী ক্রিপস্ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিযোদ্গার করলেন ; কংগ্রেস লীগ অনৈক্য তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত যুক্তি ! ক্রিপস্ সাহেব যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তাতে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমপর্য্যায়ভূক্ত অধিকার দানের অঙ্গীকার ছিল ; কিন্তু দেশরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছিল বড়লাটের হাতে। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ভারতবর্ষ ; কিন্তু তার নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব থাকবে একমাত্র বৃটিশ প্রভূর হাতে। এধরনের মেকী স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে জাগ্রত ভারতবর্ষ ভুলতে পারে না। কংগ্রেস তাই সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কংগ্রেস রামগড় অধিবেশনে প্রস্তাব নিয়েছে পূর্ণ-স্বাধীনতা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ক্ষুদ্রতর প্রস্তাবে ভারতবাসী সম্মত হবে না। কারণ 'স্বাধীনতা' ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার।' ক্রিপস্ প্রস্তাবের জাল ফেলে ধূর্ত্ত সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল ; কিন্তু ভারতের অগণিত স্বাধীনতা-প্রয়াসী জনসাধারণের সংগ্রাম-শীল মনোভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে।

ক্রিপস্ প্রস্তাবের ব্যর্থতায় ভারতের অন্তরাত্মা মুক্তির জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। কংগ্রেস-নেতারা তখন ভাবছেন, তাঁদের কি কর্ত্তব্য ! মহাচীনের দুর্দ্দশায় তাঁরা মর্ম্মপীড়িত ; সোভিয়েট রাশিয়ার বেদনায় তাঁরা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু স্বাধীন ভারত ব্যতীত কে তাদের পাশে এসে প্রকৃত মিত্রের ন্যায় সর্ব্বশক্তি ও উপযুক্ত সম্মান নিয়ে দাঁড়াবে ? পরাধীন ভারতের সে অধিকার নেই।

**প্রতিক্রিয়া : আগষ্ট আন্দোলন—**

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সারা ভারতের মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধী উত্থাপিত

'ভারত ছাড়' বা 'কুইট ইণ্ডিয়া' .প্রস্তাব গৃহীত হল। সমস্ত ভারতের মর্ম্মবাণী যেন ঐ দুটি শব্দের মধ্যে মূর্ত্তি পেল। ভারতের শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে, প্রতি জনপদে ছড়িয়ে পড়ল মন্ত্রের মত এই প্রাণময় ধ্বনি—"ভারত ছাড়!" প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন যে, কোন আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ণধারদের কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি আবেদন করবেন; জানাবেন তাঁদের যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের সহানুভূতি কাদের দিকে, কিন্তু কেন সসম্মানে মিত্রপক্ষকে সে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করতে পারছে না। কিন্তু মূঢ় সাম্রাজ্যবাদী শাসক মিঃ চার্চ্চিল তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই রাজনৈতিক বিশ্বাসে অন্যতম বিশ্বাসী লর্ড লিনলিথগো ভারতের তৎকালীন বড়লাট; কাজেই দাস-জাতির নেতার বক্তব্য শ্রবণের মত ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। ৯ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী সহ সমস্ত ভারতীয় নেতাদের একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল। বিভিন্ন প্রদেশে চলল গ্রেপ্তার, আর খানাতল্লাসী। নেতাদের এই গ্রেপ্তারে সমস্ত দেশ রুখে দাঁড়াল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণের বৃটিশবিদ্বেষ। অনেক নেতা আত্মগোপন করে আন্দোলনের গতি নির্দ্দেশ করতে লাগলেন। রক্তের আল্পনায় আর গুলির আগুনে যে চিত্র সেদিন অঙ্কিত হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা **আগষ্ট আন্দোলন** নামে অমর হয়ে থাকবে। 'করি কিংবা মরি', এই মৃত্যুভয়হীন দৃপ্ত সঙ্কল্প-বাক্য সমস্ত দেশে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল; টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেললাইন উপড়ে ফেলা—এই হল প্রতিশোধকামী জনতার সংগ্রামাত্মক ক্রিয়াকলাপ। নারী ও শিশুকে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হল, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হল, ছাত্র শ্রমিক মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ দিল। কিন্তু তবু দেশের মানুষের মনে একই প্রতিজ্ঞা—'আঘাত কর।' বালিয়া, সাতারা, ভাগলপুর, মেদিনীপুর আগষ্ট আন্দোলনের পুণ্যতীর্থ। আগষ্ট

আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমেদাবাদের উমাভাই কাদিয়া। মাতঙ্গিনী হাজরা, হিমু কালানী বহু শহীদের অন্যতম।

## বৃটিশ শাসনের অভিশাপ : বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—

সমস্ত দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে জর্জ্জরিত, তখনই দেখা দিল মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা, সঙ্গে নিয়ে এল মহামারী। বহুশত নরনারীর মৃত্যু হল। যথাসময়ে এই দুর্য্যোগের সংবাদ দেশবাসীকে জানতে দেওয়া হল না। এই দুর্য্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই এল বাংলার দারুণ দুর্ভিক্ষ দুঃস্বপ্নের মত! তোমাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তাদের হয়ত স্মরণ আছে। মাত্র সেদিন যেমন বীভৎস দাঙ্গার ফলে কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব আর পেশোয়ারের পথে-ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, দুর্ভিক্ষেও ঘটেছিল এমনি। ১৯৪৩ সালে কলকাতার রাজপথে সমস্ত বাংলার যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তা বাঙ্গালী বহুদিন ভুলবে না। মানুষের তৈরী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু ঘটে। পরবর্ত্তী কালে সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, প্রতি লোকের মৃত্যুতে চাউলের চোরা কারবারীরা হাজার টাকা লাভ করেছিল। দেশের যাঁরা নেতা, তাঁরা কারাগারে, সরকার উদাসীন; তখনকার লীগ মন্ত্রিসভা দুর্নীতির স্রোতে নিমগ্ন। কাজেই দুর্গত বাংলাকে কে বাঁচাবে? যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিক এই সময়ে ভারতে জাপ-আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা গেল। মাদ্রাজে ১৪ই অক্টোবর এবং কলকাতায় ৫ই ডিসেম্বর বোমা পড়ল। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করে বার্লিন হয়ে ১৯৪৩ সালে মে-জুন মাসে ব্রহ্মে এসে পৌঁছালেন; আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্ম এই সময়ে। আরাকানে এবং মণিপুর সীমান্তে এঁদের বীরত্ব-কাহিনী সবারই জানা।

## কারাগারে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ও মুক্তি—

এই সময়েই ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী পুনা জেলে অনশন আরম্ভ করেন। বড়লাট লিনলিথগো বলেছিলেন, গান্ধীজীর মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা তিনি গান্ধীজীর মৃত্যুর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের ফলেই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গান্ধীজীকে ১৯৪৪ সালের মে মাসের ৬ই তারিখে সকাল আটটায় মুক্তি দিতে বাধ্য হল। কিন্তু এর পূর্ব্বেই গান্ধীজীর প্রাণপ্রিয় সহকর্ম্মী মহাদেব দেশাই এবং সহধর্ম্মিণী কস্তুরীবার মৃত্যু ঘটেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে গান্ধীজী তবু ভারতের মুক্তির জন্যই আবার কাজে নামলেন! লিনলিথগোর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বহু যুদ্ধে পরাজিত বিখ্যাত লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের বড়লাট। তিনি এই অর্দ্ধনগ্ন ফকিরের সাক্ষাৎ করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এই যখন দেশের অবস্থা, তখন গান্ধীজী ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসায় সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। গান্ধী-জিন্না আলাপ এবারও ব্যর্থ হল।

## ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি ও ওয়াভেল প্রস্তাব—

ধীরে ধীরে কংগ্রেস-কর্ম্মীরা মুক্তি পেতে লাগলেন। আগষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতায়, দুর্ভিক্ষে ও অত্যাচারে দেশের মাঝখানে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা কেটে যেতে লাগল। ১৯৪৫ সালের মে মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য মুক্তিলাভ করলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপের যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটেছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল জনমত ভারতের সহিত বৃটেনের বোঝাপড়ার জন্য বিশেষ চাপ দিতে লাগল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার ফলে দেশের মধ্যে প্রবল জাগরণ এল। বহু অত্যাচারে জর্জ্জরিত জনসাধারণ নেতাদের কণ্ঠে মুক্তির বাণী শুনতে পেল। নেতাদের মুক্তির পর বোম্বাইএ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম বৈঠক হল। সেখানে বিভিন্ন প্রস্তাবে কংগ্রেস জনসাধারণের বিপ্লবী কার্য্যকলাপের

অভিনন্দন জানাল। লর্ড ওয়াভেল সিমলা সম্মেলন আহ্বান করলেন। ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাবে ক্রিপস্ প্রস্তাবেরই সারমর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি অস্থায়ী কালেব জন্য এক অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের কথা বললেন। তবে ডোমিনিযান ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, ইউরোপীয়, তপশীলী ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন আরম্ভ হল। প্রস্তাবে হোম মেম্বার অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র-সচিব, অর্থ-সচিব, রেলওয়ে-সচিব ভারতীয়রাই হবেন, একথা বলা হল। এমন কি, বৈদেশিক ব্যাপারেও ভারতীয়দের হাতে কর্ত্তৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। সম্মেলনে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হিন্দু মহাসভার কোন সভ্যকে আহ্বান করা হয়নি। বড়লাট প্রত্যেক দলকে সদস্যদের নামের তালিকা দাখিল করতে অনুরোধ করলেন। মিঃ জিন্না তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তিনটি দাবী তুললেন; তন্মধ্যে একটি হল এই যে, বড়লাটের নতুন পরিষদে পাঁচজন মুসলমান সদস্যই তাঁর বা লীগের দ্বারা মনোনীত হবেন। অথচ কংগ্রেসে যথেষ্ট মুসলমান সদস্য আছেন। কংগ্রেস স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতীয় নরনারীর বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। কাজেই এ প্রস্তাবে সকলে একমত হতে পারলেন না। সিমলা সম্মেলন ভেঙ্গে গেল।

**ভারতে গণজাগরণ**

এমন সময়েই অনুষ্ঠিত হয় ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল ভীষণভাবে হেরে গেল। মিঃ চার্চ্চিল ও এমেরীর দল ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জগতে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। এরা চিরকালই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে। মিঃ এ্যাটলির নেতৃত্বে বৃটেনে শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করল; এদিকে ভারতবর্ষে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এই সময়েই ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজী সুভাষ বসুর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাদের বিচার সুরু হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে, বিশেষ করে ক্যাপটেন রশীদ আলির মুক্তি-দাবীতে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র, মজুর, কেরাণী ও মধ্যবিত্ত যেভাবে বৃটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠে, তা অভূতপূর্ব্ব। এই বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা গেল বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহে। ভারতের মাটিতে সিপাহী বিদ্রোহের পর এতবড় সামরিক বিদ্রোহ আর ঘটেনি। মনে রাখতে হবে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের বাইরে গঠিত হয়েছিল। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট ঘোষিত হল। একমাত্র বোম্বাইতে শত শত ধর্ম্মঘটী মজুর ও মধ্যবিত্ত মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কংগ্রেস-নেতাদের হস্তক্ষেপে নৌ-বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল! ভারতের মুক্তিযুদ্ধের দুর্নিবার গতি দেখে এবং কতকটা বিদেশস্থ ভারতহিতৈষী জনগণের চাপে বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণল। জাপ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন ডাচ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুদূরপ্রাচ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। ভারতের আবহাওয়া শান্ত করার জন্যই বড়লাট সাধারণ নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস এবং লীগ—হিন্দু ও মুসলমান আসনে বিপুল সাফল্য অর্জ্জন করল! কংগ্রেস আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করল। লীগ বাংলা ও সিন্ধুতে মন্ত্রিসভা গঠন করল। পাঞ্জাবে কংগ্রেস এবং ইউনিয়নিষ্ট পার্টির সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হল। নির্ব্বাচন উপলক্ষে লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার পরবর্ত্তী কালের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বুনে গেল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রেরিত একদল প্রতিনিধি ভারত পরিভ্রমণে এলেন। তোমরা শুনলে হাসবে যে, তাঁরা বিলেত ফিরে গিয়ে বললেন যে, আমরা স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত হয়েছি! এতদিন পরেও এটা নাকি বিলেতে নতুন খবর!

**কমন্স সভায় মন্ত্রীমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা—**

১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—ভারতসচির পেথিক লরেন্স, সেই পুরোনো স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, আর মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে গঠিত এক মন্ত্রীমিশন ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে ভারতে যাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার এই ঘোষণায় দেশ-বিদেশে বিশেষ সাড়া দেখা গেল। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র সংগ্রাম-স্পৃহা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তার সঙ্গে মোকাবিলা করবার সৎসাহস ছিল না। তাই তারা নতুন ভাবে দেশের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল। রামেশ্বর ব্যানার্জ্জি, কদম রসুল, উমাকান্ত, জান মহম্মদের বুকের রক্তে যে বিপ্লবী বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার দৃঢ় ভিত্তি ভেঙ্গে দেবার জন্য সচেষ্ট হল।

**মন্ত্রীমিশনের ভারতে আগমন ও প্রস্তাব দাখিল—**

মার্চ্চ মাসের শেষে মন্ত্রিগণ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছুলেন। বিভিন্ন দল নিমন্ত্রিত হলেন। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, আকালী, জাতীয়তাবাদী মুসলিম, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন দলকে তাঁদের বক্তব্য দাখিল করতে বলা হল। কিন্তু লীগের জিদের ফলে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আস্কারায় আলোচনা মন্দপথে চলল। কংগ্রেস ও লীগ একমত হতে পারল না। কংগ্রেস-নেতারা অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী। ক্ষুদিরাম থেকে অগণিত শহীদের রক্তের দাগে ভারতের মানচিত্র রঙ্গিন। মুক্তিকামী ভারত খণ্ডিত ভারতের দৃশ্য কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবী কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখে মন্ত্রীমিশন

ও বড়লাট মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন ; তাতে লীগের পাকিস্থানী দাবী মুখে অস্বীকার করা হলেও কার্য্যতঃ মেনে নেওয়া হল। কারণ মন্ত্রীমিশন তাদের প্রস্তাবে কতকগুলি প্রদেশকে নিয়ে এক একটি গোষ্ঠী রচনার জন্য সুপারিশ করলেন। ফলে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যাকে নিয়ে 'ক' গোষ্ঠী ; পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধুকে নিয়ে 'খ' গোষ্ঠী, বাঙ্গালা ও আসামকে নিয়ে 'গ' গোষ্ঠীর রচনার প্রস্তাব করলেন। গোষ্ঠী রচনার আসল কথা হল এই যে, গোষ্ঠীভুক্ত প্রদেশগুলি গণপরিষদে প্রাথমিক বৈঠকাদির পর পৃথকভাবে বসে তাদের শাসনতন্ত্র রচনা করবে এবং সেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পরে পরিষদের সংখ্যাগুরু সদস্যদের ভোটে ইচ্ছা করলে যে কোন প্রদেশ তার গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। বিভিন্ন নেতার মতে, এই হল পাকিস্থানের ছদ্মরূপ এবং এতে অনিচ্ছুক প্রদেশগুলির মধ্যে রেষারেষি চলবে। ফলে প্রদেশের উন্নতি বাধা পাবে। আসাম বিশেষ করে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। কারণ সে অমুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশ, কিন্তু গোষ্ঠীতে যোগদান করলে সে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠতার খপ্পরে পড়বে। আসাম তাই গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করল। কতকাংশে তারই আন্দোলনে এই প্রস্তাব ভেস্তে যায়।

মন্ত্রীমিশনের এই প্রস্তাবে দেশীয় রাজাদের উপর কোনই চাপ দেওয়া হয়নি ; বরং তারা আদৌ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করবে কিনা এবং করলে কোন্ কোন্ সর্ত্তে করবে, তারই আলোচনার জন্য দেশীয় রাজাদের একটি আলোচনা কমিটি গঠন করতে বলা হল। প্রকারান্তরে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা দেবার জন্য উস্কানি দেওয়া হল।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করার জন্য গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হল। কংগ্রেস এতদিন গণপরিষদের দাবীই করে এসেছে। তবে রামগড় কংগ্রেসে সে প্রস্তাব করেছিল, পূর্ণবয়স্কদের ভোট দানের অধিকারের

ভিত্তিতে এই গণপরিষদ গঠন করতে হবে। ক্রিপস্ প্রস্তাবে গণপরিষদের দাবী স্বীকৃত হয়নি। কয়েক বৎসর আন্দোলনের পর গণপরিষদের দাবী স্বীকৃত হলেও পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের দাবী মানা হয়নি। এর ফলে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে যাদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল না, তাদের এবারও কথা বলবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল।

**অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ঃ কংগ্রেস—**

কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবকে সর্ত্তসাপেক্ষভাবে গ্রহণ করল; কারণ এই প্রস্তাবের মধ্যে ভারতের অগ্রগতির পথ ছিল। প্রস্তাবে দুইটি অংশ ছিল; একটি ছিল স্বল্প-মেয়াদী, অপরটি ছিল দীর্ঘ-মেয়াদী। স্বল্প-মেয়াদী প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করতে অনুরোধ করা হল; দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবে গণপরিষদ বা রাষ্ট্রগঠন পরিষদের প্রসঙ্গ বর্ণনা হল। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর সুরু হল রাজনৈতিক পাশা খেলা। লীগ প্রথমে বিনা দ্বিধায় সম্পূর্ণ প্রস্তাবটাই গ্রহণ করল; পরে প্রস্তাবের দীর্ঘ-মেয়াদী অংশ বাদ দিয়ে স্বল্প-মেয়াদী অংশ গ্রহণ করল। কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একমত হতে না পেরে প্রথমে স্বল্প-মেয়াদী প্রস্তাবে উল্লিখিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনে রাজী হয়নি। পরে বৃটিশ সরকারের বিশেষ প্রতিশ্রুতি পেয়ে ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, ডাঃ জন মাথাই, মিঃ আসফ আলি (পরে মিঃ আসফ আলি আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঐ স্থানে মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করেন), মিঃ সি. এইচ. ভাবা, শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম, সর্দ্দার বলদেব সিং, স্যার সাফাত আহম্মদ খাঁ এবং মিঃ আলী জহীরকে নিয়ে কংগ্রেস অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন

করে। ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই কংগ্রেস তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে দান করেছিল। নব ভারতের নতুন ভাবধারার প্রবর্ত্তক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নতুন মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতি ও পররাষ্ট্রসচিব পদ অলঙ্কৃত করলেন।

কার্য্যভার গ্রহণ করেই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার বিবিধ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তাই দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ না করেও লীগ কেবলমাত্র বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের চক্রান্তে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে অত্যন্ত নির্লজ্জের ন্যায় পিছন দরজা দিয়ে স্থান গ্রহণ করল। মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ, মিঃ গজনফর আলি খাঁ, মিঃ আই. আই. চুন্দ্রিগড়, সর্দ্দার আবদুর রব নিস্তার ও মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, স্যার সাফাত আহমদ খাঁ ও মিঃ আলী জহীর পদত্যাগ করেন। লীগের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদানের পর আবহাওয়া এত বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে, কংগ্রেস অন্তত: দু'বার পদত্যাগের সঙ্কল্প করে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করে লীগের পক্ষে ক্ষমতা দখলের মারামারি করা ব্যতীত অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস তবু ভারতবর্ষকে যতদুর সম্ভব মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। বহু কষ্টে বিপত্তির মধ্যেও রাষ্ট্রসংঘ (U.N.O.) প্রভৃতিতে পণ্ডিত নেহেরুর নির্দ্দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিরা প্রশংসার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানবপ্রেমিক প্রতিনিধিরা ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘে কার্য্যকলাপের প্রশংসাবাদ করছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশগুলি এতে শক্তিশালী হয়েছে।

## লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে কংগ্রেসের প্রবেশের কিছু পূর্ব্বেই ১৬ই আগষ্ট লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র ফলে কলকাতার নারকীয় হত্যালীলা সংঘটিত হল।

কলকাতার হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে পুলিশ ও মিলিটারীর গুপ্ত সমর্থন ছিল, এমনধারা অভিযোগ অনেকেই করেছেন। এই দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বাংলা সরকার এক তদন্ত কমিশন বসান। অনেক টাকা খরচ করাব পরে কেন যে তা ভেঙ্গে দেওয়া হল, সে কথা কেবল তাঁরাই বলতে পারেন। এই দাঙ্গা সাধারণ মানুষের যারা শত্রু তাদের সৃষ্টি, তা অনুমান করা যায়। কারণ ডাক ও তার ধর্ম্মঘটিদের সমর্থনে ২৯এ জুলাই কলকাতার সাধারণ ধর্ম্মঘট উপলক্ষে যে বিরাট গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল, হিন্দু মুসলমান মজুর মধ্যবিত্ত কেরাণীদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব মিলন গড়ে উঠেছিল, তা দেখে ভারতের মুক্তিবিরোধী শক্তিগুলি মুষড়ে পড়েছিল। ফলে তাদেরই চক্রান্তে ও লীগ মন্ত্রীসভার সহযোগিতায় কলকাতায় ১৬ই আগষ্ট অতর্কিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (যাকে কেউ কেউ 'নাদিরশাহী হত্যাকাণ্ড' বলেছেন) ঘটল। কিন্তু ভারতের শত্রুদের এই আচরণে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার আগুন কলকাতা থেকে নোয়াখালী, নোয়াখালী থেকে বিহার, বিহার থেকে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে সুদূর সীমান্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস-নেতারা, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, খান আবদুল গফফর খান এই ভ্রাতৃবিরোধের অবসানের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন, তা মানুষের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করবে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতার আগুন যাতে বেশীদূর না ছড়াতে পারে, তার জন্য হিন্দু মুসলমান চাষী মজুরের দানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন এত বিপত্তি জয় করেও যে সত্য পথে চলেছে, তার কারণ দাঙ্গা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা দাঙ্গার মনোবৃত্তি আমলাতন্ত্রের অজস্র উস্কানি সত্ত্বেও তীব্রতর হয়ে ওঠেনি। কাশ্মীরের প্রজা আন্দোলন থেকে সুরু করে দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলন এবং কলকাতা, বোম্বাই, কানপুর ও কয়লা খনির শ্রমিকদের স্বাধিকার অর্জ্জনের লড়াইযে দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিস্তৃতি লাভ করতে

পারেনি বরং সাম্রাজ্যবাদের আসনই টলে গেছে। তারই ফলে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় 'গোষ্ঠী' রচনার জন্য যে চাপ দেওয়া হয়েছিল, তা বদলাতে প্রভুরা বাধ্য হলেন। নতুন করে তাঁরা ফতোয়া জারী করলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেলকে তল্পিতল্পা গুটাতে হল। এলেন এবার বড়লাট হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিখ্যাত রণবীর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

## রাষ্ট্রগঠনে কংগ্রেস—

বৃটিশ প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। লীগ রাষ্ট্রগঠন পরিষদে যোগদান করেনি। তার রাগের কারণ এই যে, কংগ্রেস 'গোষ্ঠি' রচনার সুপারিশ নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করেছে। মন্ত্রী মিশনও ঘোষণা করেছিলেন য, সম্পূর্ণ পৃথক দুটি রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পাবেন না। কংগ্রেস তার আদর্শ অনুযাযী রাষ্ট্রগঠনেব কাজ সুরু করে দিল। বিদেশে বিভিন্ন স্থানে দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হল। আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত রূপে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সদস্য এব দিল্লীর প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা মিঃ আসফ আলি, এবং চীনে রাষ্ট্রদূতরূপে মিঃ কে. পি এস্. মেনন নিযুক্ত হলেন। অন্যান্য স্থানেও দূতাবাস গঠন সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন। ভারতে রাষ্ট্রগঠন পরিষদের কাজ সোৎসাহে সুরু হল। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করে পণ্ডিত নেহেরু রাষ্ট্রগঠন পরিষদে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। কমন্স সভায় মিঃ এ্যাটলি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পথে বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা লীগ তোষণের জন্য বললেন যে, দেশের

অনিচ্ছুক অংশের উপর রাষ্ট্রগঠন পরিষদের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হবে না, অর্থাৎ বাঙ্গালা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়,— বর্ত্তমান রাষ্ট্রগঠন পরিষদে তারা যোগদান না করায় এর কোন প্রস্তাব মানতে তারা বাধ্য থাকবে না । এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার একটি বিরোধের বীজ রেখে গেল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পথে আবার প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা গেল।

## পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে দাঙ্গা—

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে দাঙ্গা মারাত্মক রূপ গ্রহণ করল। সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থী বিহার ও নোয়াখালির ন্যায় বাড়ী-ঘর ছেড়ে অন্যত্র ছুটল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিদেশী আমলাতন্ত্র নির্ব্বাক দর্শকের মত বহুক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনা দেখল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন। সীমান্ত গভর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব এবং সীমান্তের অবিসংবাদী নেতা খান আবদুল গফ্ফার খান প্রকাশ্যে এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ এবং পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান জেঙ্কিন্স সম্পর্কেও বিভিন্ন অভিযোগ শোনা গেছে। কংগ্রেস দেশে এই অরাজকতা দেখে বৃটিশ সরকারকে আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ দিতে লাগল। কমন্স সভায় মিঃ এ্যাটলি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই তাঁরা ভারত ত্যাগ করবেন। বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে ভারত ত্যাগের এই নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণায় ভারতের জনসাধারণেরই জয় ঘোষিত হল। কারণ লালমোহন, সমীরুদ্দিন, সুখেন্দুবিকাশ, যশোদা, নাসিম, সর্ব্বেশ্বর ডালু জীবন দিয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মহাত্মা গান্ধীর পূত দৃষ্টান্তে এবং শুভাশীর্ব্বাদে উদ্বুদ্ধ অগণিত কংগ্রেস কর্ম্মী বিহারে ও নোয়াখালীতে

দাঙ্গা-বিরোধী ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে ভবিষ্যৎ ভারতের বনিয়াদ রচনা করে চলেছেন। সাম্প্রদায়িকতার আগুন তবু নিভল না; কারণ লীগ তখনও রাষ্ট্র গঠন পরিষদে যোগ দেয়নি; মন্ত্রিসভায় যোগদান করেও যৌথ দায়িত্ব স্বীকার করেনি। চারদিকে অশান্তির আগুন দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ছে, অথচ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের হাতে হাঙ্গামা দমনের উপযুক্ত ক্ষমতা বৃটিশ সরকার দেয়নি। দেশ শাসনের দায়িত্ব আছে, অথচ দেশ শাসনের ক্ষমতা নেই—কংগ্রেস এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থা মানতে রাজী হল না। কংগ্রেস তাই আগামী বৎসরের জুন মাসের পূর্ব্বেই দেশ শাসনের সমস্ত ক্ষমতা দাবী করল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার সমপর্য্যায়ভুক্ত করতে বলা হল; নইলে কংগ্রেস দেখল, তার পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দেশের অনেক দুর্গতি হয়ে গেছে।

### মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা—

লর্ড ওয়াভেল অপসারিত। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট। ভারতের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনা করে তিনি এক প্রস্তাব বিলেতে বড়কর্ত্তাদের অনুমোদনের জন্য পাঠালেন। তাঁরা আবার সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্বয়ং ম্যাউণ্টব্যাটেনকেই ডেকে পাঠালেন। তিনি আলোচনার জন্য বিলেত ছুটলেন। এসে ৩রা জুন আমাদের জানালেন যে, ভারত ও পাকিস্থান এই দুইটি রাষ্ট্রে ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করা হবে। টুকরো টুকরো কেন করা হবে, তার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হল এই যে, এই ব্যবস্থা না হলে মিটমাট হয় না। লীগ ধনুকভাঙ্গা পণ ধরেছে, পাকিস্থান না হলে 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি'। কাজেই স্বাধীনতার পথে এগুতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কি? ভারতবর্ষের লোক আর একবার বুঝল, সাহেব-লোক কত সৎ! নিজেই বিভেদকামীদের আস্কারা দিয়ে আজ আবার নিজেই তার সালিশী করছেন। ভারত বিভাগের

অনিবার্য্য পরিণতি হল বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগ। বাঙ্গালাদেশ খণ্ড থাকবে কি অখণ্ড থাকবে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চল ও মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যদের পৃথক ভোটে তার মীমাংসা হবে এবং যে কোন অঞ্চল বিভাগের পক্ষে মত দিলেই বিভাগ হয়ে যাবে।

নিজেরা তাঁরা ভাগ করলেন না, বাঙ্গালীর উপরই বাঙ্গালাদেশকে দু'টুকরো করবার ভার দেওয়া হল। মাকে কাটবার ভার সন্তানের ওপর!—এব চেয়ে সাধু ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! কারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মনে অবিশ্বাসের বিষ আগেই ত তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন। পাঞ্জাব সম্পর্কেও ঐ একই ওষুধের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু এতেও তাঁরা নিরস্ত হলেন না। আসামের শ্রীহট্ট জেলায় মুসলমান সংখ্যাগুরু, লীগ সমস্ত আসাম পাকিস্থানে দাবী করেছে। এরকম অবস্থায় সেখানে গণ্ডগোল না হলে ভাল দেখায় না। অতএব শ্রীহট্ট পাকিস্থানে যাবে কি হিন্দুস্থানে যাবে তার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা হল। সীমান্ত প্রদেশ মুসলমানপ্রধান; সেখানে কংগ্রেসী খান ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম প্রভাব। লীগ সীমান্ত প্রদেশ দাবী করা সত্ত্বেও সেখানে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কি করে ক্ষমতায় থাকে। হিন্দুর সঙ্গে নয় কেবল, এবার মুসলমানে-মুসলমানে দাঙ্গা যাতে বাধে তার ব্যবস্থা করা হল। ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থানের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। বলা হল যে, এই দুইটি রাষ্ট্র ১৫ই আগষ্ট থেকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্য্যাদা লাভ করবে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক বিল উত্থাপন করে এ্যাটলি সাহেব ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নে ও পাকিস্থানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও মিঃ জিন্না গভর্ণর জেনারেল হবেন। তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুমোদন করে এক বিল পাশ করলেন। এই বিলের নাম ভারতের স্বাধীনতা বিল। কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের সম্মতিক্রমেই ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ন হল এবং গভর্ণর জেনারেলরা নিযুক্ত হলেন।

পণ্ডিত নেহেরু দেশবাসীকে এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে বললেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণে তিনিও সুখী নন। কিন্তু আপাততঃ এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর পাওয়া যাচ্ছে না। লীগ ইতিপূর্ব্বে গোটা বাঙ্গালা, আসাম ও পাঞ্জাব প্রদেশ দাবী করেছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব্বে একপ্রকার তাও তাকে দিয়েছিল। কিন্তু এবার বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হল। স্বদেশী যুগের কথা তোমরা আগের এক প্রবন্ধে পড়েছো। এই বাঙ্গালা বিভাগ রদ করার দাবীতেই ঐ আন্দোলনের জন্ম। বলা যেতে পারে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাতই সেদিন, তা তার রূপ যেমনই হোক না।

২৬শে জুন বাঙ্গালা বিভাগ হয়ে গেল; বাঙ্গালীর জীবনে এর চেয়ে দুঃখকর আর কি হতে পারে! কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ একশ্রেণীর লোকের মনে আজ এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, এছাড়া নেতারা আর কোন পথই বোঝেন না। বাঙ্গালাদেশ কেটে দুটো প্রদেশ হল, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ। শ্রীহট্টের গণভোটের ফলে শ্রীহট্ট পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হল। বাঙ্গালায় সুরাবর্দ্দী মন্ত্রীসভা বাদে আর একটি অনুরূপ মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস এই মন্ত্রীসভা গঠন করল। সীমান্তের কংগ্রেস-নেতারা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ভিত্তিতে গণভোটে যোগ দিলেন না। "পাঠান দেশটা পাঠানদের"—এই দাবী তুলে তাঁরা আন্দোলন সুরু করলেন।

## ১৫ই আগষ্ট

১৫ই আগষ্ট! ভারতের জীবনে এ একটি লাল তারিখ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হচ্ছি আমরা মর্য্যাদার অধিকারী, স্বাধিকার অর্জ্জন করছি আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যে; এমন কি আমাদের দাবীর ফলে ভারতের মাটি থেকে অত্যাচারী গোরা সৈন্য শীঘ্রই অপসারিত হবে, তারও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি। গান্ধীজী বহুবার বলেছেন, আভ্যন্তরিক অশান্তি দমনে

স্বাধীন ভারত যদি বৃটিশ সৈন্যের সহায়তা নেয়, তবে তা বড়ই লজ্জার কথা। বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হবে, এ প্রতিশ্রুতি দিলেও সাম্রাজ্যবাদ ভারতের অনিষ্ট করবার কম চেষ্টা করেনি। তারা লীগের দেশ বিভাগের দাবী ১৬ই মে-র প্রস্তাবে বাতিল করে পরে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ৩রা জুন মেনে নিয়েছে; তারা বাঙ্গালা বিভাগ ১৬ই মে-র প্রস্তাবে অন্যায় বলেও পরে মেনে নিয়েছে, এবং দেশীয় রাজাদের অবশ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করতে হবে, তা তারা আজও বলেনি। বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন আজ আবার নতুন করে আলোচনা করে তাদের কতকগুলি সর্ত্ত দিযে ভারতীয় ইউনিয়নে আসতে বলেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি একথা বলেন নি। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা অনেক অংশে ভারতের জনসাধারণের চেয়েও দুঃখে বাস করে। আজ যদি দেশীয় রাজাদের তাদের স্বৈব শাসনের বিরুদ্ধে একটি কথাও না বলা হয়, এবং প্রজাদের আন্দোলনে সমর্থন না জানানো হয়, তাহলে আর স্বাধীন ভারতেব মর্য্যাদা থাকবে কোথায় !

## স্বাধীনতা ও স্বরাজ

রাষ্ট্রগঠন পরিষদে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে দেখতে চাই সত্য, কিন্তু তাই বলে স্বাধীন ভারতে অত্যাচারী শাসক এবং সাম্প্রদায়িক শাসকের স্থান দিতে আমরা রাজী নই। কাশ্মীর থেকে সুরু করে সুদূর মণিপুরকে পর্য্যন্ত নিয়ে এক সুখী ও স্বাধীন দেশ গড়ে উঠে, এই আমাদের ভারতবর্ষের ধ্যানস্বরূপ। কিন্তু কূটনীতির চক্রান্তে সে রূপ আজ কলঙ্কিত। তবু আমরা তাতে হতাশ হব না। কারণ, ভারতের দেশপ্রেমিক নরনারী বারবার বিদ্রোহ করেই আজ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের দুরন্ত সংগ্রাম থেকে এর সুরু। সেই মিছিল ১৮৮৫, ১৯০৭, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪০, ১৯৪২ সাল হয়ে ১৯৪৬ সালেও শেষ হয়নি। বহুবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সন্ধির জন্য নানা রকম সর্ত্ত দিয়েছে।

তার সর্ত্তের প্রত্যেকটি কুমতলব আমরা বানচাল করে দিয়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করে এগিয়ে এসেছি। তাই স্বাধীনতার নবারুণ অভিবাদনের সৌভাগ্য পেয়েছি আমরা। কিন্তু সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি; সংগ্রাম এখানেই শেষ হবে না। গুজরাটের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে গান্ধীজী বলেছিলেন, স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু স্বরাজ এখনও বহু দূরে। ভারতের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু মহাত্মার একথার অর্থ আজ মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেই আমরা জানব যে, মিছিলের এইখানেই শেষ নয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবন যতদিন না সহজ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয় ততদিন মিছিলের অভিযান থামবে না। যতদিন না সমস্ত ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়, ততদিন তো আর বিশ্রাম নেই। দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার পুঁজি নিয়েই একদিন সে সাম্রাজ্যবাদকে ভারত ছাড়ার দাবী জানিয়েছিল, সে দাবী আজ সমগ্র এশিয়ায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইন্দোচীনে কামানের মুখে, ইন্দোনেশিয়ায় জনগণের দুর্জ্জয় প্রতিরোধ-সংগ্রামে। এই দাবীই একদিন সাম্রাজ্যবাদের "দুনিয়া ছাড়া"র দাবীতে পরিণত হবে। কাজেই দেশীয় রাজ্যেও পাকিস্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হয়ত আত্মগোপন করে থাকবার জন্য শেষ চেষ্টা করবে। সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার দায়িত্ব সমগ্র ভারতের: কারণ সর্ব্ব ভারতের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "সবার আগে আমরা সকলে ভারতবর্ষীয়, সবার শেষেও তাই—তা আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বা শ্রেণীবিভাগ যাহাই হউক না কেন, আর আমরা যে প্রদেশের অধিবাসীই হই না কেন। ধর্ম্ম তো সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেকেই নিজের ভাবে নিজের স্রষ্টার আরাধনা করিতে পারেন।...

"আমি পুনরায় এই কথা বলিতে চাই যে, ভারত-বিভাগ আমি চাই না—কিন্তু উপস্থিত ভারত-বিভাগ ত বাস্তব ঘটনা; এবং আমাদের উহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই হইবে। বঙ্গ-বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা

বাঙ্গালীই থাকিবে এবং একই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিবে। পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুরা তথাকার মুসলমানদের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবে। সেরূপ করিলে পূর্ব্ব বাঙ্গালার মুসলমানগণ নিশ্চয়ই প্রতিদানে তথাকার হিন্দুদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিবে। তাহাদের পক্ষে অন্যকে শত্রু মনে করা কখন উচিত হইবে না। মাত্র এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই ভয় তাড়াইয়া দিতে পারা যাইবে।"

## ১৫ই আগষ্টের প্রতিজ্ঞা

পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে সম্প্রীতির ফলেই আমরা দুটো কাটা দেশকে জোড়া দিতে পারব। বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের এই বিষয়ে দায়িত্ব আরও বেশি, কারণ আমাদের বাঙ্গালা দেশ আজ দু'টুকরো হয়ে গেছে। যুক্ত বাঙ্গালাই কেবল তার ঐতিহ্যের গর্ব্ব করতে পারে। এই সম্প্রীতি কেবল সাধারণ হিন্দু মুসলমানের সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠতে পারে। এই বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছা ব্যতীত আমরা বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারব না। বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যিকারের স্বাধীন আমরা হতে পারব না। আর সত্যিকারের স্বাধীন যদি আমরা না হই, তা'হলে ক্ষুদিরাম থেকে সুরু করে মাতঙ্গিনী হাজরা পর্য্যন্ত অগণিত শহীদ কিসের জন্য জীবন দিয়েছিলেন? তাঁদের ধারাবাহী বলে গর্ব্ব করবার অধিকার ত আমাদের থাকবে না।

শোনা যাচ্ছে, পাকিস্থান একবার যখন ডোমিনিয়নে ঢুকেছে, তখন ঐ খোয়াড় থেকে সে আর বেরুবে না। যদি সত্যিই তা হয়, তা'হলে বড়ই দুঃখের বিষয়। মিঃ জিন্না পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ায় অনেকের মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। কারণ অস্থায়ী পদের জন্য কি আর তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন? লোকের মনে এ সন্দেহ যাতে না থাকে, তার জন্য লীগ মহল থেকেও এর কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। ব্যাপারটি যদি সত্য

হয়, তা'হলে কেবল পাকিস্থানের নয়, ভারতীয় ইউনিয়নের দুর্ভাগ্য। কারণ স্বাধীন ভারতের পাশে যদি কোন তাঁবেদার রাষ্ট্র থাকে, তা'হলে ভারতের পক্ষে দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে অসুবিধায় পড়তে হবে। ভারতীয় ইউনিয়ন ডোমিনিয়নে থাকবে না, একথা সুনিশ্চিত। কারণ পণ্ডিত নেহেরু রাষ্ট্রগঠন পরিষদে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছেন, ভারতীয় ইউনিয়ন স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হবে। দেশবিভাগের সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত রদ করে দিতে হবে, প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার অনাচার দমন করতে হবে, তবেই বহু শহীদের আত্মদানের সার্থকতা হবে। মহাত্মাজীর কথা তোমরা স্মরণ করবে, স্বরাজ এখনও বহুদূরে। চল্লিশ কোটী নরনারীর সুখসমৃদ্ধি আনতে পারলেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে।

১৫ই আগষ্টের উৎসব তাই কেবলমাত্র ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্থানের উৎসব নয; তার বাইরে যারা রয়েছে, তাদেরও এ উৎসব। কিন্তু তারও পূর্ব্বে আমাদেব উচিত ভারতীয় ইউনিয়নের বাইবে রয়েছে যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য, তাদেব ভাবতীয় ইউনিয়নে আনা। কেবলমাত্র যোগদানে বাধ্য করলেই চলবে না, 'প্রজারাজে'ব প্রতিষ্ঠা সেখানে করতে হবে। গান্ধীজী-কল্পিত 'কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ'—এই হল ভবিষ্যৎ ভারতের ধ্যানমূর্ত্তি! জনগণের যে মিছিল বিদেশী শাসনেব বিরুদ্ধে বহু দুর্য্যোগ মাথায় করে একদিন যাত্রা সুরু করেছিল, তার তাই আজও বিশ্রাম নেই। ১৫ই আগষ্টে তারা আজ নতুন করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুক—ঐক্যবদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদেব আদর্শ। সেই আদর্শের জয় হোক!

**জয় হিন্দ্**

———

# মনুষ্যত্বের সাধনায়

## শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

'আমার জীবনই আমার বাণী'—শান্তির অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধীর মুখের এই কথা বাঙ্গালার তরুণ সমাজে আলোড়ন এনেছে, তারা সঙ্কল্প নিয়েছে মহাত্মার জীবন-সাধনাকে সার্থক করে তুলবে—বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিকে কিছুতেই ব্যাহত হতে দিবে ন।

কলকাতা সারা ভারতবর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র, এখানে শান্তি অব্যাহত রাখতে পারলে সারা ভারতই শান্ত থাকবে, এই ধারণা থেকেই গান্ধীজী কলকাতাকে গুণ্ডাবাজী থেকে রক্ষা করবার জন্য আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব্বসন্ধ্যা থেকে মহানগরীর পথে পথে ও প্রতি পল্লীতে যে মহামিলন ও ঐক্যের বান দেখা দিলো, মহাপুরুষের মনে তা' খানিক স্বস্তি আনলেও তাঁকে সোয়াস্তি দিতে পারলো না। মহাত্মাজী কলকাতার আবহাওয়া দেখে বুঝেছিলেন যে, হয়ত অচিরেই দাঙ্গা-ক্লান্ত নাগরিকদের মধ্যে একটা ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা দিবে, কিন্তু তা হবে নিতান্তই বুদ্বুদ। সেই আসন্ন শান্তির বহিঃপ্রকাশ যাতে স্থায়ী হতে পারে, নিতান্ত বুদ্বুদের মত যাতে তা' মিলিয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন মহাত্মাজী। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সহরের দাঙ্গা-দুর্গত বস্তিগুলোতে এক এক করে শিবির স্থাপন করবেন এবং স্থানীয় লোকদের মনে ধীরে ধীরে এমন করে তাদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করবেন, যাতে তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে শান্তি রক্ষার সঙ্কল্প নিতে উদ্বুদ্ধ হবে। মহাত্মার এই সিদ্ধান্তের 'সংবাদ

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল, আর সবাই বিস্মিত হল এই খবর পড়ে যে, গান্ধীজীর এই শান্তি-অভিযানে তাঁর সহগামী হবেন আর কেউ নয়, স্বয়ং সুরাবর্দ্দী সাহেব। সাপের বিষ ঝারা সত্যই কি সফল হয়েছে তাহলে? যাই হোক এ সুলক্ষণ বটে!

১৩ই আগষ্ট। নির্দ্ধারিত এই দিনে মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রিয় শহীদ সাহেবকে নিয়ে সদলে বেরুলেন তাঁর শান্তি অভিযানে। একাজে গান্ধীজীর প্রথম শিবির বসেছে দুর্গত বেলেঘাটার এক বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত বস্তিতে। প্রেম, প্রীতির, শান্তির বাণী নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এসে উঠলেন তাঁর শিবিরে।

শান্ত সুনির্ম্মল সকাল। বেলেঘাটার আবহাওয়া অতর্কিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল মহাত্মার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে। একদল স্বার্থবুদ্ধি লোক তবু কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করছিল; শুধু দ্বিধা কেন বলি, তারা গান্ধীজীর কাজে বাধা সৃষ্টি করতেই বরং চেয়েছিল! তাদের প্ররোচনায় একদল ছেলে মেয়ে জড়ো হল গান্ধীজীর শিবিরের সামনে তাদেরই নেতৃত্বে। এদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারে মারমুখো। এ বিক্ষোভের যারা নেতা তারা ছেলেদের বুঝিয়েছে,—বেলেঘাটাকে লোকের কাছে হেয় করবার জন্যই গান্ধীজী পার্ক সার্কাসে না যেয়ে বেলেঘাটায় এসেছেন, যে সুরাবর্দ্দীর নেতৃত্বে কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং যার শাসনকালে লাখো লাখো লোক হয়েছে পরিজনহীন, গৃহহীন, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গান্ধীজীকে কখনো বেলেঘাটায় থাকতে দেওয়া হবে না; কারণ, সুরাবর্দ্দী সাহেবের উপস্থিতিতে বেলেঘাটায় গুণ্ডারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে—শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়ে আরো অশান্তি দেখা দিবে।

এসব শেখানো কথা, টুকরো টুকরো স্লোগানে যখন জনতা চিৎকার করে বলছিল, সে সময় মহাত্মা আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব থেকে মানুষকে কি করে রক্ষা করা

যায়, ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে কি করে সফল করে তোলা যায় তার চিন্তায় মগ্ন। বাহিরের চিৎকারে বেরিয়ে এলেন শিবির থেকে মহাত্মাজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল বসু। তিনি বুঝিয়ে শান্ত করলেন উত্তেজিত জনতাকে, বল্লেন ঃ আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি দেবো মহাত্মার পক্ষ থেকে। শান্ত পরিবেশের মধ্যে বসে আপনাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যতক্ষণ দরকার আলোচনা করতেও কোন আপত্তি নেই। জনতার পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হল নির্ম্মলবাবুকে। স্থানীয় বিশিষ্ট এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে বৈঠক বসল। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে আলোচনায় অনেক রাত্রি হয়ে যায়। পরদিন সকাল বেলা আবার বসে বৈঠক। এমনি করে তিন-চার দিনের চেষ্টার ফলে নির্ম্মলবাবু বেলেঘাটার বিক্ষুব্ধ অধিবাসীদের প্রায় সকলের মনের সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত অবিশ্বাস দুর করতে সমর্থ হলেন। ছেলেরা প্রায় সবাই প্রতিশ্রুতি দিল, তারা বেলেঘাটার শান্তি রক্ষায় আন্তরিক ভাবেই আত্মনিয়োগ করবে।

প্রশ্ন উঠেছিল, যে সব বস্তিতে গুণ্ডাদেব আড্ডা ছিল, পুনঃ সংস্থাপনের সুযোগে তারা যদি আবার সেখানে আড্ডা তৈরী করার সুবিধা পায় তা'হলে কি করে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে। গান্ধীজীর পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছিল যে, গুণ্ডাদের পুনঃসংস্থাপনের কোন কথা উঠেনা—কারণ তাদের স্থান সমাজে নয়। কিন্তু যারা শান্তিপ্রিয়, যারা নিরীহ, সুস্থ সামাজিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা তারা পাবে না কেন ? এ যুক্তি না মেনে আর উপায় কি ? সুরাবর্দ্দী সাহেব সম্পর্কেও যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার উত্তর গান্ধীজী নিজেও বারবাব বিভিন্ন প্রার্থনা সভায় সুস্পষ্ট ভাবেই দিয়েছেন। এক পক্ষের অভিযোগ শুনেই কোন বিচার চলে না আর বিচারের উদ্দেশ্য যখন সংশোধন এবং সে সংশোধন যদি সত্য করেই এসে থাকে, তা'হলে শান্তির প্রশ্ন আর তত হয়ে দাঁড়ায় না। সংশোধন সত্যই হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে এবং

তা' নিশ্চয়ই সময় সাপেক্ষ। এ সময়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংস্থাপন কার্য্যে সুবাবর্দ্দী সাহেবের সহযোগিতা যদি পাওয়া যায়, সে সহযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে? পার্ক সার্কাস অঞ্চলের উশৃঙ্খল অধিবাসীদের শান্ত-সংযত করবার ভার যদি শহীদ সাহেব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং তথাকার পলায়িত বা বিতাড়িত হিন্দু অধিবাসীদের পুনঃসংস্থাপন যদি সম্ভব হয় তাঁর চেষ্টায়, তাতে আপত্তির কথা কি করে উঠতে পারে? এসব যুক্তিতে বেলঘাটাবাসিগণ তাদের ভুল বুঝতে পারল, তারা লজ্জিত হল তাদের কার্য্যাকলাপের জন্য। তাদের উশৃঙ্খল আচরণে মহাত্মার আসবাব-পত্রের ক্ষতি হয়েছে, তবু তিনি ক্ষুব্ধ হন নি, তাদের ক্ষমা করেছেন এই বলে যে, ও কিছু নয়। একথা যখন রাষ্ট্র হয়ে পড়ল, তখন অনু-শোচনায় অধোবদন হল বিক্ষোভকারীরা, সমবেত ভাবে যেয়ে তারা ক্ষমাপ্রার্থী হল মহাত্মাজীর কাছে। এমনি করে গান্ধীজী তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেব হৃদয় জয় করলেন বেলেঘাটায়।

১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যা থেকে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মহানগরীর পথে পথে, পল্লীতে পল্লীতে কোন্ যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মহা-মিলনের উন্মাদনা দেখা দিল? সত্যই কি মানুষের মনে শুভবুদ্ধি ফিরে এল? মহাত্মাজী কিন্তু পুরো-পুরি আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না এ উল্লাস-উচ্ছ্বাসে। তবু সহরময় দেখা যেতে লাগল মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য—মুসলমান হিন্দুভাইকে আতর জলে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, হিন্দু তার প্রতিবেশী মুসলমান ভাইকে অতীতের তিক্ততাকে ভুলে যেতে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছে।

এভাবে কাটলো কিছুদিন। হিন্দু-মুসলমান একে অন্যের পাড়ায়, এমন কি মেয়েরাও চলাফেরা করছে—একবারে নির্ভয় নিশ্চিন্ত। কিন্তু আগষ্টের সীমান্তে এসে শান্তিপ্রিয় নগরবাসী যেন শুনতে পেল হত্যাকারীদের সেই কণ্ঠস্বর! কলকাতার আকাশে আবার দেখা দিল দুর্য্যোগের খণ্ডমেঘ। গান্ধীজী বিচলিত হলেন। আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা থেকে মানুষকে

রক্ষার জন্য অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এতদিন ধরে যে প্রেম ও কল্যাণের বাণী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন, তা' কি ব্যর্থ হবে? মানুষের কল্যাণ-বোধ কি এতটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, চরম মূল্য দিয়েও মহাত্মা তা' জাগ্রত করতে পারবেন না? স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে অনশনে আত্মবিসর্জ্জনের চরম পরীক্ষা দ্বারাই গান্ধীজী এ প্রশ্ন মীমাংসার বজ্রকঠোর সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন।

১লা সেপ্টেম্বর। জাতির পক্ষে অকল্যাণ ও কলঙ্কময় এই দিনটিতে সুপ্ত ঘাতকেরা যেন হঠাৎ জেগে উঠল। বেলেঘাটায় বেশ পূর্ণ উদ্যম নিয়েই সুরু হয়েছিল পুনঃসংস্থাপনের কাজ। কিন্তু এ আকস্মিক উপদ্রবের দরুন এ-কাজে যে শুধু ছেদ পড়ল তাই নয়, পলায়িত যে সব দুর্গতকে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, তাদের রক্ষা করবার প্রশ্নও গুরুতর হয়ে দেখা দিল। এদের নিরাপদ স্থানে রাখবার দায়িত্ব নিলেন কয়েকজন। কিন্তু, তাদের পৌঁছে দিয়ে আসবার কালে দুর্বৃত্তদের উন্মত্ত আচরণে দু'জন অতিশয় দরিদ্র লোককে প্রাণ দিতে হল, কয়েকজন আহতও হল, মহাত্মা ছুটে এলেন নগ্নপদে ঘটনাস্থলে। সে কি তাঁর মর্ম্মবেদনা! নিজ হাতে করলেন আহতের সেবা। মর্ম্মাহত মহাত্মা দাঙ্গা না থামলে অনশনে আত্মবিসর্জ্জন করবেন এই ঘোষণা প্রসঙ্গে জানালেন,—শান্তি পুনঃসংস্থাপনের প্রথম দিন ১৪ই আগষ্ট থেকেই আমি বলছি যে, এই শান্তি হয়ত হানাহানির সাময়িক বিরতি মাত্র। অলৌকিক কিছু ঘটে নি। কলিকাতা নগরী কি আবার পাশবিকতার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে?

মহাত্মা গান্ধী নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। যদি এ পাশবিকতার অবসান ঘটানো সম্ভব না হয়, তা'হলে জীবনে বেঁচে থেকে তাঁর পক্ষে আর দুঃখ পাওয়া কেন?—তার চেয়ে হিংসার এ অনলে আত্মাহুতি দেওয়াই বরং শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা হারানো পাপ। মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধির উপর গান্ধীজীরও বিশ্বাস অসীম। তাই ৩১শে

আগষ্ট রাত প্রায় দশটায় একজন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লোককে সামনে রেখে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা যখন তাঁর শিবির প্রাঙ্গণে এসে চড়াও হল, তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা জানালা ভেঙ্গে ফেলতে লাগল, তখনও করজোড়ে গান্ধীজী এগিয়ে এলেন ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করতে। কিন্তু ক্ষিপ্ততার অবসান হল না তাতে, তাঁকে লক্ষ্য করে উদ্যত হল লাঠি—নিক্ষিপ্ত হল ঢিল। সবই ব্যর্থ হল বটে, তবে তাতে মহাত্মার রক্ষীদের আহত হলেন কয়েকজন। গান্ধীজীর তখনও আশা, এরা এদের ভুল বুঝতে পারবে, এরা অনুতপ্ত হবে।

১লা সেপ্টেম্বর অনশনের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'ভারতকে বহু কষ্টাজ্জিত এই স্বাধীনতা যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে এদেশের সব নর নারীকে 'লীঞ্চ' রীতির কথা একেবারে ভুলতে হবে। এখানে যা হচ্ছে তা সে রীতিরই সামান্য অনুকরণ মাত্র।...সভ্যসমাজের মৌলিক নিয়ম মেনে না চললে কলকাতা বা অন্যত্র শান্তি রক্ষার কোন উপায় নেই।' যাই হোক্ জীবন-সায়াহ্নে এসে মহাত্মাকে যাতে অনশনের কষ্ট পেতে না হয়, যাতে তিনি তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তার জন্য গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারিয়া, প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবর্গ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। কিন্তু গান্ধীজী সঙ্কল্পে অটল হিমালয়ের মত। তিন ঘণ্টা ধরে তিনি রাজাজীর তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল খণ্ডন করে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনশন আরম্ভ করেন।

মহামানবের অনশন আরম্ভে দেশময় গভীর উদ্বেগ, সকলেরই মনে একটা গভীর অস্বস্তি। ক্ষীণদেহ মানুষটির শক্তি উপবাসের ফলে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। সকলেরই হৃদয়ের অন্তস্থল তাতে আলোড়িত। শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তানের এ দুঃখভোগের পাপ কত দিন বাঙ্গালাকে ভোগ করতে হবে? বাঙ্গালী, বিশেষ করে বাঙ্গালীর তারুণ্য চঞ্চল হয়ে উঠল মহাত্মার মহামূল্য জীবনরক্ষায়। নিজেদের জীবন বলি দিয়েও তারা কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এল। শচীন্দ্রনাথ, স্মৃতিশ, সুশীল ও বীরেশ্বর গুণ্ডাদের নিবৃত্ত করবার জন্য, তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে হাসিমুখে আত্মদান করে শহীদ হলেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের আবেদন ও আহ্বানে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সমগ্র সহরময় প্রবল জনমত গড়ে উঠল। পাড়ায় পাড়ায় শান্তিসেনাদলের অভিযান ও শান্তির আন্দোলনের কার্য্যকরী ফল দেখা যেতে লাগল। দাঙ্গাকারীদের আয়ত্তে আনতে পারে এরূপ একদল লোক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে কথা দিয়ে গেল যে, তারা তখনই দাঙ্গা থামিয়ে দেবে। সংখ্যায় তারা হবে পঞ্চাশ। তারা মহাত্মাকে একথা জানিয়ে গেল যে, দাঙ্গার পাণ্ডাদের তারা ধরে আটকে রেখেছে। এ পাণ্ডারাই সেদিন রাত্রিতে গান্ধীজীর শিবিরে উৎপাত করেছিল। যে লোকটি গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে লাঠি ছুঁড়েছিল সে ত ধরা পড়েছে জানা গেল এবং তারা সবাই এসে মহাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর দেওয়া শাস্তি মাথাপেতে নিতে রাজী। তব তিনি অনশন ভঙ্গ করুন এই তাদের প্রার্থনা। মহাত্মাজী উত্তরে জানালেন, "আমি তখনই অনশন ত্যাগ করব, আপনারা যখন আমাকে এ আশ্বাস দেবেন যে, সারা পশ্চিম বাঙ্গালায়, চাই কি সারা ভারতে যদি আগুন জ্বলে উঠে, তাহলেও মুসলমানরা আমার কাছে এসে আমাকে বলবে যে তাদের কোন ভয় নেই, তারা নিরাপদ। সহরের সকল গুণ্ডাকে সংযত করতে পারি এমন আশা আমি করিনে—করতে পারলে আনন্দিত হতাম, কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণ শুচিতা, অনাসক্তি ও স্থির প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা ত আমার নেই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে যদি তাদের মুক্ত করতে না পারি, তবে জীবনে আর কি প্রয়োজন, এ জীবন আর টেনে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে।...আমার অনশন অমঙ্গলের শক্তিকে স্বতন্ত্র করে দেয়, আর এই শক্তি স্বতন্ত্র হওয়া মাত্রই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, কারণ অমঙ্গল বা পাপ নিজের জোরে কখনও দাঁড়াতে পারে না। সেজন্য আমি আশা করি যে, আমার অনশনের ফলে আপনারা আপনাদের কল্যাণ-মূলক কাজে আরো জোর পাবেন এবং নিজেদের পীড়িত মনে করবেন না।" যারা এসেছিল, তারা ফিরে গেল গান্ধীজীর জবাব পেয়ে। কথানুযায়ী কাজ না করা পর্য্যন্ত তাঁকে অনশন ভাঙ্গবার জন্য বলতে আর ভরসা

পেল না তারা। তারপর সন্ধ্যার দিকে এল আর একদল, তারা এসে আত্মসমর্পণ করল গান্ধীজীর কাছে—৩১শে আগষ্ট রাত্রির অশিষ্ট আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল।

অনশনের তিন দিন পূর্ণ হয়ে এল। গান্ধীজী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। নেতৃবর্গ চিন্তাকুল। তবু তাদের মনে আশা, বৃহস্পতিবার সারাদিন যখন শান্তিপূর্ণ ভাবে কেটেছে, তখন গান্ধীজীকে অনশন ত্যাগ করতে সম্মত করানো যাবে। দিনের শেষে তারা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী-শিবিরে যেয়ে উঠলেন। তাঁরা খুব আশা নিয়েই মহাত্মাজীকে জানালেন যে, দাঙ্গা আর হবে না,—তাছাড়া এবারের হাঙ্গামা নিছক গুণ্ডাদেরই ব্যাপার, সাম্প্রদায়িক নয়। একথায় কিন্তু মহাত্মা খুশি না হয়ে বিরক্তই হলেন। তিনি তাঁদের মৃদুভর্ৎসনা করে জানালেন যে, দাঙ্গার নৈতিক দায়িত্ব গুণ্ডাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, তার পশ্চাতে আশ্রয় খুজবার এ প্রয়াস সমর্থন করা যায় না। সাধারণ নাগরিকের কাপুরুষতা বা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতির সুযোগ নিয়েই যে হাঙ্গামাকারীরা অনর্থ ঘটাবার সুযোগ পায়, একথা ভুললে চলবে না। এর-পর অনশনভঙ্গের অনুরোধ সম্বন্ধে মহাত্মাজী প্রতিনিধিদলকে সোজাসুজি দুটি প্রশ্ন করেন—তাঁরা কি এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, কলকাতায় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা আর কখনও দেখা যাবে না, এবং তারা কি বলতে পারেন যে, কল-কাতার নাগরিকদের হৃদয়ের যথার্থ পরিবর্ত্তন হয়েছে, যার ফলে তারা আর কোন হাঙ্গামা এখানে হতে দেবে না বা তাতে কোনরূপ প্রশ্রয় দেবে না। এ নিশ্চয়তা পেয়েও কিন্তু গান্ধীজী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি আরও বললেন, "ধরুন আপনাদের এসব আশ্বাসের পরও যদি আবার আর একটা দাঙ্গা বাঁধে, তখন কি হবে? আপনারা কি আমার কাছে লিখিত ভাবে এ প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারুর উপর এতটুকু অত্যা-চার হবার পূর্ব্বে আপনারা তাতে বাঁধা দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করবেন, আগুন নিভাতে প্রাণ দেবেন, তবু পারলাম না এ সংবাদ দিবার জন্য

ফিরে আসবেন না। এরূপ লিখিত নিশ্চয়তা পেলেই আমি অনশন ভঙ্গ করতে পারি। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাদের মুখে এক কথা ও মনে অন্য কথা থাকলে আমার মৃত্যুর জন্য আপনারা দায়ী হবেন। কারণ তখন আমাকে যে অনশন অবলম্বন করতে হবে, তা আর ত্যাগ করা চলবে না।” মহাত্মার এই আবেগপূর্ণ কথাগুলোতে সারাঘর জুড়ে একটা গভীর নিস্তব্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি হল। কিছু কিছু যুক্তি তর্ক হল লিখিত প্রতিশ্রুতি দিবার ব্যাপার নিয়ে। এমনি সময় গভর্ণর রাজাজী ও কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী এসে উপস্থিত হলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শহীদ সাহেব একটা বড় কথা বললেন গান্ধীজীকে,—“মুসলমানরা আপনাকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করত। কিন্তু আপনি তাদের যে কল্যাণ সাধন করেছেন, তাতে তাদের হৃদয় এরূপ সাড়া দিয়েছে যে, আজ তারা আপনাকে তাদের পরম বন্ধু ও সহায় বলে মনে করে।” রাজাজী সে কথারই একটু বিন্যাস করে বললেন, “গান্ধীজী আজ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের কাছেই অধিকতর নিরাপদ।”

যাই হোক্, গান্ধীজীর কথা নড়চড় হবার নয়, একথা সবারই জানা। তাই প্রতিনিধিদল পাশের ঘরে যেয়ে স্থির করলেন যে, লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি তারা দিবেন কলকাতায় আর কোন দাঙ্গা হতে দেওয়া হবে না। এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই না তবে মহাত্মাজী ৭৩ ঘণ্টা পর অনশন ভঙ্গ করলেন। মানুষের প্রতি এরূপ মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত কোথায়? যেখানে অশান্তির দাবানল সেখানেই ছুটে গিয়ে উপস্থিত মানব-কল্যাণ চিন্তায় বিভোর এই আত্মভোলা সন্ন্যাসী। পাঞ্জাবের গণ্ডগোলের কথা শুনে মহাত্মাজী অস্থির হয়ে পড়েছিলেন সেখানে ছুটে যাবার জন্য। তাই অনশন আরম্ভের প্রাক্কালে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি বলেছিলেন,—“কলকাতাবাসী যদি চান যে, আমি পাঞ্জাবে যেয়ে সেখানকার বিপন্ন লোকদের সেবা করি, তা'হলে অনশন যত শীঘ্র ভঙ্গ করতে পারি, তারা আমায় তেমনি শক্তি দিন্।”

আজ গান্ধীজীর প্রভাবে কলকাতায় যে সুস্থ জনমত গড়ে উঠেছে তাতে

আশা করা যায় সারা বাঙ্গলা সাম্প্রদায়িক বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। উত্তর ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি বিস্তার করেছেন। তাঁর শান্তিপ্রয়াস সার্থক হোক, ভারতের প্রত্যেক কল্যাণকামী এ কামনা করে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—বিশ্বকবির একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। মহাত্মার সে বিশ্বাস অগাধ বলেই তিনি জীবন সায়াহ্নেও মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ-পথের সন্ধান দিয়ে যেতে পারবেন বলে ভরসা করতেন! বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে বৃহৎ ঐক্যের সন্ধান করে ফেরে, কবি তাকে বলেছেন, শিবম্। এই যে মঙ্গল, তারই পথপ্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী। ছোটো খাটো দ্বন্দ্ব ভুলে বিশ্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে সমগ্র সুখদুঃখের ভালোমন্দের অংশীদার হয়ে মানবাত্মার পূর্ণবিকাশেই জীবনের সার্থকতা।

বিশ্বজনের প্রাঙ্গণ তলে লহ আপনার স্থান
তোমার জীবনে সার্থক হোক নিখিলের আহ্বান

জীবন সার্থক করার এই প্রয়াস ও প্রেরণা যেমন রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্ব্বত্র, তেমনি পাই মহাত্মার জীবন-সাধনার প্রতি অধ্যায়ে।

আজ আমরা যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছি তার মূল কোথায় তা' আমরা সবাই জানি। রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্ট করেই বলে গেছেন, "সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনে ভারতবর্ষের বাইরে।... আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশঃ উৎকট হয়ে উঠেছে। সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের ঊর্দ্ধস্তরে কোনো এক গোপনকেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত, তাহলে

কথনই ভারত ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।...

যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম, তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনাই করতে পারিনি...।”

মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ অপরাধ বলে ঘোষণা করে গেছেন। তাই আমরা আশা করে বলি ঃ

এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

( ১ )

ম গো যায় যেন জীবন চলে,

শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে

'বন্দে মাতবম্' বলে।

আমার যায যেন জীবন চলে ॥

যখন মুদে নয়ন কবরো শয়ন

শমনের সেই শেষ জালে,

তখন সবই আমার হবে আঁধার,

স্থান দিও মা ঐ কোলে!

আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমার মান অপমান সবই সমান,

দলুক না চরণ-তলে।

যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন

মানুষ হবো কোন কালে?

আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

লাল টুপি আর কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত,
পাশব বলে দিক্ জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমি ধন্য হবো মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি-কাঠে ঝুলিলে ;
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে নয় সইতে রাজি,
উত্তমে চায় মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে।

—কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ

( ২ )

দুর্গম গিরি-কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘেরিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! 'বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥'
গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।

কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার ॥
কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথ ক্লাইভের খঞ্জর !
ঐ গংগায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার ॥

– নজরুল ইসলাম
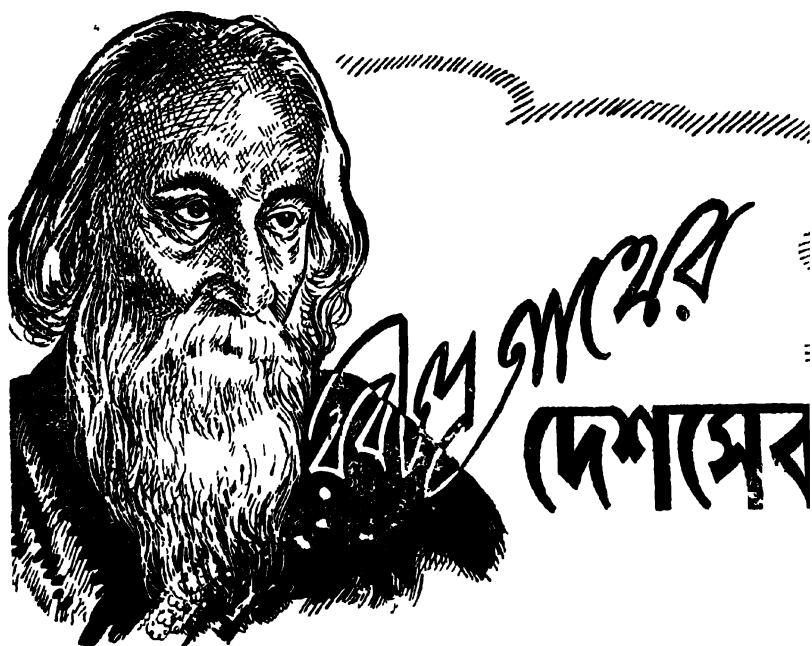
শ্রীনরেশ গুহ

আজ থেকে ৪২ বছর আগে—আশ্বিন মাসের এক ভোরবেলা কলকাতা মুখরিত হ'য়ে উঠলো গানে গানে। প্রত্যুষেই খালি পায়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে দলে দলে লোক যেতে লাগলো—সকলের মুখে গান। সকলের মন উদ্বেগ আকুল, সকলের মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ঘরে ঘরে সেদিন অরন্ধন, সকলেরই উপবাস। আশ্বিনের শিশির-ছলছল সেই প্রভাতে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে পূর্ব আর পশ্চিম বাংলা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বেঁধে দিয়ে গেয়ে উঠেছিল—

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,<br>
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,<br>
এক হউক, এক হউক, এক হউক,<br>
হে ভগবান!"

সমগ্র দেশকে ভালোবাসার কথা বাঙালী সেই প্রথম শিখলো। বাংলাদেশের হৃদয়কে সেদিন যিনি এক করতে পেরেছিলেন, রক্তচক্ষু গবর্ণমেণ্টের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন, তিনিও সেদিন গঙ্গার তীরে সেই বিপুল জনতার একপাশে নগ্নপায়ে দাঁড়িয়েঃ সেই রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন।

অনেক দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন কতকাল। বাংলাদেশ সেদিন সমস্ত ভারতকে যা শিখিয়েছিল, আজ বাংলাদেশ সমস্ত ভারতকে তা ভোলাইতে চাইছে। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের তখন তো শৈশব মাত্র। ইংরেজ-শাসন চাই না, আমার দেশ আমার হোক—এসব কথা মুখ ফুটে বলতে তখন সামান্য লোকই পারতো। সহসা রাজার আদেশ তুচ্ছ ক'রে বাংলাদেশ ভারতকে বিস্মিত ক'রে দিল। কবির গানে বাঙালীর বুক ভ'রে উঠলো বাঁধন ছেঁড়ার দুঃসাহসে।

গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়েছিলেন আসাম আর পূর্ব বাংলাকে অবশিষ্ট বাংলা থেকে খসিয়ে আবার নতুন একটা প্রদেশ গড়া হবে। মনে মনে বাংলার হিন্দুর বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানকে উত্তেজিত করে তোলার ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে বাংলাদেশ তার জবাব দিল—কিছুতেই না।

'বিধির বাঁধন কাটবে, তুমি এমন শক্তিমান ?
তুমি এমন শক্তিমান ?'

ঐক্যবদ্ধ শক্তির আনন্দে, উত্তেজনায়, বেদনায় ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বাঙালী সেদিন তার স্বদেশকে চিনলো। সে স্বদেশ শুধু মাটি গাছ পাহাড় প্রান্তরে গড়া নয়,—সে স্বদেশ সকলের জননী।

কিন্তু জনতার কোন আন্দোলনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও প্রকাশ্য উত্তেজনার ঢেউ শান্ত হ'য়ে এলো। স্কুল-কলেজ ছেড়ে যারা এসে নবগঠিত 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদে' ঢুকেছিল, আবার তারা স্কুল-কলেজে ফিরে গেল। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা অধিকার নিয়ে

বিশ্রী ঝগড়া-বিবাদ শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন দেশের এই উন্মাদনা, প্রাণের জাগ্রত আবেগকে দেশগঠনের—গ্রাম-গঠনের কাজে তিনি আকৃষ্ট করতে পারবেন। আশৈশব দেশের সেবা বলতে তিনি গ্রামের সেবাই বুঝেছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা যখন বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায়, গরম বক্তৃতায় মঞ্চ কাঁপিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তো তখন আঠারো-কুড়ি বছরের যুবক মাত্র। বক্তৃতায় দেশোদ্ধার হয়, একথা সেই বয়সেই তাঁর বিশ্বাস হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন জিহ্বা-আস্ফালনে দেশের কোনোই মঙ্গল নেই। গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদন ক'রে তাদের চৈতন্য করাতে যে শক্তিটা ব্যয় হয়, তা যদি গ্রামের সেবায় নিয়োগ করা যায়, তা'হলে স্বরাজের জন্য আমাদের আর পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। স্বাধীনতা তো বাইরে থেকে আমাদের কেউ দিয়ে দিতে পারে না, স্বাধীনতা লাভ করতে হয়। দেশকে যদি সেই স্বরাজ-লাভের যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুলতে না পারি, তা'হলে গরম বক্তৃতা ক'রে, মিছিল ক'রে, ধর্মঘট ক'রে কিছুই হবে না।

সেই দেশ বলতে কী বোঝায়? দেশ মানে তো দেশের মানুষ? তাদের মধ্যে শতকরা আশীজনই থাকে গ্রামে। তারাই দেশ, তাদের সেবাই দেশের সেবা। শেষ জীবনেও তাদের কথা কবিতায় বলেছেন—

'...ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
...অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে...'

'ওরা' মানে দেশের সাধারণ মানুষ। এদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখ-শান্তির আয়োজন করার কথা স্বদেশী আন্দোলনেরও অনেক আগে থেকে তিনি ব'লে এসেছেন। শিলাইদহ গ্রামে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারী ছিল। দীর্ঘ দিন রবীন্দ্রনাথ গ্রামে থেকে সেই জমিদারী দেখাশোনা করেছেন। তাই দেশের চাষী এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের প্রকৃত অবস্থা যে কী, তা তিনি ভালো করেই জানতেন।

এই শতকরা আশীজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাকি শতকরা কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন ইংরেজী শিক্ষিত লোক নিরাপদে সহরে ব'সে বক্তৃতার মঞ্চে তুফান তুললে—তাতে দেশের কী? গবর্ণমেণ্ট তো আমাদের মঙ্গলের জন্য এতটুকু চিন্তিত নয়। কাজেই আমাদের চিন্তা আমাদেরই করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, এবং বিদ্যালয় চালানোর জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিক্ষা করবো না। কেননা, আমাদের দেশে কোন দিনই বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা রাজা করেননি, ব্যবস্থা করেছে সমাজের সকলে মিলে একত্র হয়ে। আমাদের চাষীর মঙ্গল আমরাই করবো, মামলার সর্বনেশে চক্রান্তের হাত থেকে আমরাই বাঁচাবো তাদের, সমাজের সকল প্রকার দায়িত্ব আমাদেরই। ১৩১৪ সালে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে এই 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের কল্পনা দেশের সামনে রাখলেন। পরবর্তী জীবনে সেই কল্পনাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে গ্রাম-গঠনের কাজে।

উদ্‌ভ্রান্ত বাংলা সেদিন তাঁর কথার কোন মূল্য দেয়নি। গোপনে গোপনে বাংলার মৃত্যুভয়হীন একদল যুবক সশস্ত্র বিপ্লব ক'রে রাতারাতি একটা অলীক উপায়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখছিলেন। আজকাল বোমা, বন্দুক, কামানের কথা শুনে আমরা তেমন ভয় পাইনে। কিন্তু সেদিন সাধারণ বাঙালীর কাছে 'বোমা' কথাটা একটা বিভীষিকার মত ছিল। বাঙালী বিপ্লবীরা বোমার কারখানা বানিয়ে গোপনে গোপনে বিপ্লবের জন্য

প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। এদিকে কোথায় গেল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই আশ্চর্য উন্মাদনা—কোথায় গেল হৃদয়ের ঐক্যবোধ। দেশসেবা চুলোয় গেল, নেতারা দলাদলিতে মত্ত হলেন।

'স্বদেশী সমাজ' গঠনের সঙ্কল্প সার্থক হলো না। রবীন্দ্রনাথ ফিরে গিয়ে কাব্যসাধনায় রত হলেন। এই প্রথম ও এই শেষবার তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত হয়েছিলেন। বহুকাল পরে তাঁর গ্রাম-গঠনের এই স্বপ্ন সার্থক করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের অন্য প্রান্তের এক সর্বত্যাগী ফকির ব্যারিষ্টার—মহাত্মা গান্ধী।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ আর কোনো দিন রাজনৈতিক আন্দোলনে নামেননি, অর্থাৎ দল গড়েননি, বক্তৃতা করেননি, সভা করেননি। কিন্তু তাঁর রচনা, তাঁর গানই দেশকে চিরদিন স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে।

দল গ'ড়ে আন্দোলন করার পথ যে তাঁর নয় সে-কথা তিনি স্থির জানতেন। লোকমান্য তিলক যুবক রবীন্দ্রনাথকে বিদেশে আন্দোলন করার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন—পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিলক পরে বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দেশসেবা তাঁর সাহিত্য-সাধনাতেই পূর্ণ হবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে এলো মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের পরেই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে গোরা সৈন্য নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়ে নিরস্ত্র অসহায় শত শত নারী-পুরুষকে হত্যা করে। ভারতবর্ষের কোন খবরের কাগজে এই খবরটা পর্যন্ত ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ গোপনে এই সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হলেন। ইংরেজের এই নির্বোধ নিষ্ঠুরতায় তাঁর চোখে ঘুম রইল না। একজন ইংরেজ রমণীকে পাঞ্জাবে কোনো এক ব্যক্তি অপমান করেছিল। বলতে গেলে এই অপমানেরই শোধ নেওয়া হলো, শ'তিনচার নিরীহ স্ত্রীপুরুষকে হত্যা ক'রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ ক'রে বড়লাটকে লিখে জানালেন—দেশবাসীর দুঃখে ইংরেজের মনে এতটুকু বেদন

বাজে না, তাই তাদের হাত থেকে কোনো সম্মান তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। পরদিন কাগজে রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রকাশিত হলো। সেই চিঠিতে দেশের লোক জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী পাঠ ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আপনার সম্মান ত্যাগ ক'রে রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেশের সম্মান বাঁচিয়েছিলেন।

চোখের সামনে মহাযুদ্ধ ঘটতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, পৃথিবীতে 'স্বজাতি-অভিমান' মানুষকে কী রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ ক'রে তোলে। জাপানে যেয়ে দেখলেন, পশ্চিমের শিক্ষায় দীক্ষায় বলদর্পিত জাপান 'স্বজাতি-অভিমানে' টগবগ করছে: কখন কোন্ প্রতিবেশীর টুঁটি টিপে ধরবে, ঠিক নেই। এই স্বজাতি-অভিমানেরই ইংরেজী নাম হচ্ছে ন্যাশনালিজম্। দেশের মঙ্গলের জন্য দরকার হ'লে অন্য জাতকে গিলে খাবো—এই হচ্ছে ইয়োরোপের স্বদেশপ্রেম বা ন্যাশনালিজমের নমুনা। পৃথিবী ঘুরে রবীন্দ্রনাথ এই বাণী নিয়েই ফিরলেন যে, সঙ্কীর্ণ স্বজাতি-অভিমান ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর সকল জাতি প্রীতিতে ও শ্রদ্ধায় যদি না মিলতে পারে, তা'হলে মঙ্গল নেই। নাহলে আবার যুদ্ধ হবে এবং পৃথিবীর শান্তি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু দেশে ফেরবার আগেই সংবাদ পেলেন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ ক'রে তার শাসন-ব্যবস্থা অচল ক'রে তুলে তাকে স্বরাজ দিতে বাধ্য করবো—এই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠানের কোনো রকম যোগ আছে, তার সঙ্গে অনেকে সম্পর্ক ত্যাগ করলে, উকিলরা আদালত ত্যাগ করলেন, ইংরেজকে বয়কট করা হলো। এমন কি ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করার জন্যও গান্ধীজী পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিলিতি কাপড় বর্জন করা হলো। ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগলো। এমন একটা অলীক কথাও প্রচারিত হলো যে, মাত্র ছয় মাস কি এক বৎসর এই অসহযোগ আন্দোলন করতে পারলেই স্বরাজ লাভ অনিবার্য্য। স্বদেশীর নামে গ্রামে গ্রামে অতি উৎসাহী যুবকরা

বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো, বিলিতি লবনের ব্যবসা জোর ক'রে বন্ধ করতে লাগলো। কিন্তু দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সে-কথা শুনবে কেন? তারা অল্প দামে জিনিস পেলে কেন বেশি দামে কিনবে? বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে তার জায়গায় বিলিতি কাপড়ের মত সস্তা দিশি কাপড় না দিতে পারলে, দরিদ্র গ্রামবাসীকে জোর ক'রে স্বদেশী ব্যবহার করতে বাধ্য করবার কোন অধিকার নেই। রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনে দেশের আন্দোলনকারীরা তাঁকে বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আলোচনা হলো। অতি উৎসাহী দেশ-সেবকরা রবীন্দ্রনাথের বাড়ির উঠানে বিলিতি কাপড়ের বস্তা এনে পোড়ালো। কিন্তু গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তবু রবীন্দ্রনাথ বললেন—'শুধু ঘরে ব'সে চরকা চালালেই এক বছরের মধ্যে স্বরাজ হবে, এত সহজ কাজের দাবী দেশবাসীর কাছে কিছুতেই রাখা উচিত নয়। আমাদের গ্রাম গঠনের কঠিন কর্তব্য যদি আমরা গ্রহণ না করি, মাত্র অসহযোগ ক'রে কিছুই হবে না। দেশসেবার কাজ কঠিন।'

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলো। আজ এতদিনে সেই গ্রাম-সেবাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ দেশসেবা ব'লে বুঝতে পেরেছি। একথা শুনে তোমরা অবাক হবে যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ক'রে সমস্ত বিশ্বের লোককে তাঁর আশ্রমে সাদরে ডাক দিয়েছিলেন। ইংরেজকে বয়কট ক'রে আমাদের মুক্তি হবে না, আমাদের মুক্ত করবে আমাদের সাধনা। ভারতের আশ্রমে এসে বিশ্বের মানুষ প্রেমে, প্রীতিতে, জ্ঞানের সাধনায় মিলিত হবে। সঙ্কীর্ণ স্বজাতি-অভিমানের মোহ অতি ভয়ানক। তার ফলেই দেশে দেশে এত হিংসা, এত হানাহানি। ভারতবর্ষ সেই জাতীয় অহমিকায় কিছুতেই অন্ধ হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা সেদিন বিশ্ববাসীর কানে গেলেও মনে প্রবেশ করেনি। তাই তো আবার আর একটা মহাযুদ্ধ চোখের সামনে আমরা দেখতে পেলাম। আর

আজ এতদিন পরে পৃথিবী বুঝতে পেরেছে যে, জাতি-অভিমান ত্যাগ ক'রে একত্র মিলিত হতে না পারলে রক্ষা নেই। তাই তো সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। কিন্তু সত্যই কি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং ন্যায়বোধ নিয়ে আমরা জাতিসঙ্ঘে মিলেছি? তা'হলে কেন ইন্দোনেশিয়ায, গ্রীসে, প্যালেষ্টাইনে আজও যুদ্ধ চলে?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বাঙালীকে দেশাত্মবোধে জাগিয়েছিলেন। আর একদিন বিশ্বভারতীর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে বিশ্বের লোককে ভালবাসতে ডাক দিলেন। তিনি তো জানতেন—দেশের স্বাধীনতা একদিন আসবেই। একটা জাতকে চিরকাল কেউ পরাধীন ক'রে রাখতে পারে না। কিন্তু স্বাধীন হ'য়ে আমরা যদি কেবলমাত্র নিজের দেশের শক্তি সাধনায় মন দেই এবং আপনার উন্নতির জন্য অপরের সর্বনাশ করতে সঙ্কোচ না করি, তা'হলে তো বিপদের অন্ত নেই! রবীন্দ্রনাথ তাই সঙ্কীর্ণ অর্থে স্বদেশসেবার কথা না ব'লে, ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বের মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য ডাক দিলেন। ভালোবাসাতেই নিষ্কৃতি।

তিনি কবি। ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সত্যের অম্লান আলোক তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। কবির দেশ তো শুধু এই বাংলাদেশ নয়; তিনি সকল দেশের, সকল কালের।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন আজও সার্থক হয়নি। পৃথিবীতে জাতিবিদ্বেষ আজও পরিপূর্ণ ভাবে বর্তমান। 'হিংসায় উন্মত্ত' আজো মানুষ। নিজের দেশে ভাইয়ের গলায় আমরা ছুরি বসাতে লজ্জায় ম'রে যাচ্ছি না। সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্য আমাদের বাঙালীর। যে বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করতে যেয়ে একদিন প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল—সেই বঙ্গকে ভঙ্গ ক'রেই তো আজ স্বাধীনতা এলো। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

১৫ই আগষ্ট, ২৯শে শ্রাবণ—স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে ঘরে ঘরে। পথে

পথে আনন্দের কলরব! রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। তবু তো ভুলতে পারছিনে বিয়াল্লিশ বছর আগেকার শিশিরে ছলছল এক আশ্বিনের প্রভাত। সমস্ত দেশ বেদনায় আকুল, দলে দলে কলকাতার লোক চলেছে গঙ্গার ঘাটে। কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান—যা দিয়ে তারা বঙ্গভঙ্গ সেদিন ব্যর্থ করেছিল। আজও যেন সেই কণ্ঠ শুনি—

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান!"

# এগারোই আগষ্ট

শ্রীস্নেহকণা গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আগষ্ট স্মরণীয় মাস। এই আগষ্ট এনেছে নিরানন্দের বার্তা, এনেছে আনন্দের বার্তা। আগষ্টেরই একদিনে উঠেছিল 'ভারত-ছাড়ো'র তূর্য্যধ্বনি,—সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব বহ্নি জলে উঠেছিল ভারতের দিকে দিকে। আগষ্টই এনেছে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' নিদারুণ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, লালে লাল করে দিয়েছে বাংলা বিহার পাঞ্জাবের জল-স্থল। আগষ্টই আনলে ভারতের মুক্তি, সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত ভারত। বিচ্ছেদ ঘটালে ভাইয়ে ভাইয়ে। আগষ্টেরই এক প্রভাতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে মুমূর্ষু জাতিকে করেছিল প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ।—সেই এগারোই আগষ্টকেই আজ বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি এই দিনেই ফাঁসীতে ঝুলেছিল ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরামের কথা কত জনেই বলেছেন কত ভাবে,—তাঁকে বাদ দিয়ে তো ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কোন কাহিনীই রচিত হতে পারে না! তবু আমরা আবার তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি সেই মহাদিন ১৯০৮এর এগারোই আগষ্টকে স্মরণ করে—যেদিন ভোর ছয়টায় এই মহাপ্রাণ কিশোর নির্ভীক চিত্তে প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রাণ দিল ফাঁসীর মঞ্চে।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ড গেছে মজঃফরপুরে জজ হয়ে। ক্ষুদিরাম আর দীনেশ রায় ( প্রফুল্ল চাকীর ছদ্মনাম ) গেছে তাকে অনুসরণ করে সেখানে ; রয়েছে এক ধর্ম্মশালায়। এরি মধ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডের কাছ থেকে সেখানে খবর পৌঁছে গেছে বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে। খবর পেয়েই কিংস্‌ফোর্ডের বাংলো পাহারা দেবার জন্য দুজন সশস্ত্র কনেষ্টবল, তহশিলদার খাঁ আর ফয়েজউদ্দীন নিযুক্ত হয়ে গেল।

৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে আছে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল। ঠিক কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ীর মতই একখানা একঘোড়ার ভাড়াটে গাড়ী যাচ্ছে বাংলোর পূর্বদিক ঘেঁসে। হঠাৎ একটা ভীষণ বোমার আওয়াজ! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মারা গেল মিসেস্‌ কেনেডি আর তাঁর মেয়ে। মেয়ে মারা গেল একঘণ্টার মধ্যেই, মা মারা গেলেন ২রা মে।

যুবকদের আকার-প্রকারের বর্ণনা দিল পাহারা-রত পুলিশ দুইজন। তাই ভিত্তি করে চারিদিকে অনুসন্ধান চলল, টেলিগ্রামও গেল সব যায়গায়। এদিকে বিপ্লবী দু'জন দু'দিকে চলে গেল। কথা থাকল, মোকামা ষ্টেশনে দু'জনে যেয়ে মিলিত হবে।

মজঃফরপুর থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ওয়াইনি ষ্টেশন। ষ্টেশনের বাইরে একখানা মুদি দোকান। অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রমে দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ক্ষুদিরাম। চলতে আর পারে না। ১লা মে বেলা আটটায় ঐ মুদি দোকানে আশ্রয় নিয়েছে সে। এই সময় ফতেসিং আর শিউপ্রসাদ সিং নামে দু'জন সশস্ত্র কনেষ্টবল গ্রেপ্তার করল তাঁকে। ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছিল দুটো রিভলবার আর ত্রিশটা তাজা কার্ত্তুজ। সে বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু অবসাদে নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে সে!

ওদিকে প্রফুল্ল চাকী যেতে যেতে সমস্তিপুর যেয়ে উঠল। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হল নন্দলাল বাড়ুয্যের। নন্দলাল ছিল সিংভূমের পুলিশ সাব-ইনস্‌পেক্টার। সে সাধারণ পোষাকে যাচ্ছিল। প্রফুল্ল কোন সন্দেহ না

করে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। প্রফুল্ল সরল ভাবে নন্দলালের কাছে তাদের অভিযানের কাহিনী বলল। দু'জনেই বেশ হাসিগল্প করে চলে এল মোকামায়। নন্দলাল গোপনে এক কনেষ্টবলকে প্রফুল্লর দিকে কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়ে খবর দিল মজঃফরপুরের পুলিশের কর্তা মিঃ আর্মষ্ট্রংকে। সে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ নিল আর্মষ্ট্রং থেকে। আর্মষ্ট্রং খুশী হয়েই অনুমতি দিল।

২রা মে বেলা প্রায় চারটার সময় নন্দলাল যখন দলবল নিয়ে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে গেল, প্রফুল্ল ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে বলে উঠল,—"আমি জানতুম না, তুমি বাঙ্গালী হয়েও এত নীচ—এত বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু আমি মুক্ত, আমায় তুমি ছুঁতেও পারবে না।" এই বলেই পিস্তলের দুটি গুলি করল—একটি নিজের গলায়, একটি মাথায়। প্রফুল্লের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল পথের মাঝে।

সরকার থেকে নন্দলাল পুরস্কার পেল যথেষ্ট, চাকরীতে তার উন্নতিও হয়ে গেল খুব। কিন্তু ভোগ করতে পারল না সে কিছুই বেশি দিন। বিপ্লবীদের হাতে সে প্রাণ হারালো।

ক্ষুদিরামকে নেওয়া হল তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে। সেখানে ক্ষুদিরাম অপরাধ স্বীকার করে বলে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল মজঃফরপুরের নব-নিযুক্ত জেলা ও সেশন জজ মিঃ কিংস্ফোর্ডকে হত্যা করা। কারণ, কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সে বহু অত্যাচার ও অবিচার করে এসেছে।

দু'তিন দিন পরেই তাকে বিচারের জন্য পাঠানো হল অতিরিক্ত সেশন জজের এজলাসে। জজ কিংস্ফোর্ড তখন বিদায় নিয়ে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য চলে গেছে পাহাড়ে।

৮ই জুন দায়রাতে বিচার আরম্ভ হল। ৯ই জুন বাবু নাথুনিপ্রসাদ ও বাবু জনকপ্রসাদকে এসেসার নিযুক্ত করা হল। সরকার পক্ষে মামলা

চালালেন মিঃ মান্নুক ও পাটনার বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার। আসামীর পক্ষে মামলা তদ্বির করবার জন্য বাবু কালীপদ বসু স্বেচ্ছায় আদালতের অনুমতি চাইলেন। পরে আরো কয়জন উকীলও এলেন তার পক্ষে। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলল যে, কলকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকবার সময় দু'বার সে জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, এবং মজঃফরপুরে বদলি হবার সময় তার বিপদ সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া এ মামলায় কিংস্‌ফোর্ডের বাংলোর পাহারাদার দু'জন, ধর্মশালার কর্তৃপক্ষ এবং আরো কয়েকজন সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিল। সরকার পক্ষে সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেলে ক্ষুদিরাম এক বিবৃতিতে বলল—

"আমার বাবা-মা-ভাই কেউ নেই। আমার জ্যেঠা, খুড়া বা মামাও নেই। আমার বড় বোন শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবীর স্বামী বাবু অমৃতলাল রায় মেদিনীপুর জজের হেড ক্লার্ক। আমি ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছি। দু'তিন বছর ধরে পড়া ছেড়েছি। জামাইবাবু (অমৃতবাবু) স্বদেশী করি বলে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার সৎ-মা বেঁচে আছেন; তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে থাকেন। আমার বয়স ১৯ বছর।

"জেলের খাদ্য বড় বিশ্রী. আমার মোটেই সহ্য হয় না, স্বাস্থ্যও আমার খারাপ হয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্যদিক দিয়ে আমার উপর কোন খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। তবে দিনরাত নির্জন সেলে থাকতে হয়, পড়বার জন্য কিছু পাওয়া যায় না, এ বড় কষ্ট। বই বা সংবাদপত্র পড়তে আমার বড় ইচ্ছে করে।

"আমার ইচ্ছে হয় একবার জন্মস্থান মেদিনীপুর এবং আমার দিদি ও ভাগ্নেদের দেখি। আমার মনে কোন দুঃখ নেই, দুঃখের কারণও কিছু নেই। কেবল দুটি অসহায় স্ত্রীলোককে ভুলে মেরে ফেলেছি, এই যা দুঃখ। গীতা আমি পড়েছি, ভয় আমার মনে এক ফোঁটাও নেই।"

১২ই জুন বিচার শেষ হল। এসেসার দুইজনই আসামীকে দোষী

সাব্যস্ত করল। জজ রায় দিলেন, আসামীকে ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হল, যে পর্যন্ত না তার মৃত্যু ঘটে (The accused is to be hanged by the neck till he is dead)। হাইকোর্টে আপীল করবার জন্য মাত্র সাত দিন সময় দেওয়া হল।

বিচারের সময় ক্ষুদিরামকে ক্ষীণ ও দুর্বল দেখা যাচ্ছিল। বিচার বা তার ফলাফল তার প্রশান্ত মনকে যেন বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করছিল না। সে অনেক সময় কাঠগড়ায় ঘুমিয়ে থাকত ছোট ছেলেটির মত। জজের গাম্ভীর্যপূর্ণ মন্তব্য শুনে সে মাঝে মাঝে মুচকি হাসত। জজ যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রায়ের মর্ম সে বুঝেছে কিনা, তখন সে হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে মাথা নেড়ে জানাল যে সে বেশ বুঝেছে।

হাইকোর্টে আপীল করা হল। ১৩ই জুলাই বিচারপতি ব্রেট্ ও রাইভস্ ফাঁসীর হুকুমই বহাল রাখলেন।

১২ই আগষ্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরুলো—১১ই আগষ্ট সকাল ছয়টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেছে। সে দৃঢ়পদে ও প্রশান্ত ভাবে ফাঁসী-মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেছে। ফাঁসীর আগে তার মাথা অচ্ছাদন করার সময়েও সে মৃদু মৃদু হাসছিল। ক্ষুদিরামের ইচ্ছানুসারে তার উকীল কালিদাসবাবু তার মৃতদেহ চেয়ে নেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে গঙ্গার তীরে ক্ষুদিরামের অন্ত্যেষ্টি কার্য করা হয়। শ্মশান-বন্ধুরা যে রাস্তা দিয়ে তার মৃতদেহ বহন করে নিচ্ছিল, সে রাস্তার দুই পাশে পুলিশের বিপুল সমাবেশ করা হয়েছিল, দর্শকদিগকে তারা দূরে সরিয়ে রাখছিল।

উনচল্লিশ বছর আগে আগষ্টের এগারোই তারিখে বাংলার বীর শহীদ ক্ষুদিরামের দেহান্ত ঘটে। আজ স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বাংলার সর্বত্র তার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অখণ্ড বাংলা ছিল ক্ষুদিরামের আদর্শ। যে সাম্রাজ্যবাদ সেই অখণ্ড বাংলাকে খণ্ডিত করেছিল, তারই মূলে আঘাত করতে চেয়েছিল সে।

আজ সাম্রাজ্যবাদ দুর হয়ে যাচ্ছে—ক্ষুদিরামের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। কিন্তু তার অখণ্ড বাংলার আদর্শ কোথায় বিলীন হয়ে গেল আজ। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত বাঙালী আজ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে খণ্ডিত বাংলাকে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী বাঙালীর জীবনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জনৈক অজ্ঞাতনামা পল্লী কবি সেই বিষয়ে যে লোক-সঙ্গীত রচনা করেছেন তাই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গানটি এখানে দেওয়া হলো। গানের সাথে বাস্তব ঘটনার যোগাযোগ না থাকলেও বিপ্লবী তরুণদের প্রতি বাঙালীর প্রভূত প্রীতি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে এই গানের প্রতি ছত্রে।

# ফাঁসীর গান

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
শনিবার দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
—ওমা, অভিরামের দ্বীপ চালনা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
ওমা, কলের বোমা তৈয়ার ক'রে
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে,
ওমা, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।

হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা ?
ওমা, রক্ত-মাংস এক করিতাম
দেখত ইংলণ্ডবাসী।
থাকত যদি টাটু ঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়ত ধরা ?
ওমা, এক চাবুকে চ'লে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।
বেলা দশটা বেজে গেল
ফাঁসীর হুকুম জারী হ'ল।
ওমা, আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসী
দেখুক ভারতবাসী।
দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে ;
চিনতে যদি না পারিস্ মা,
গলায় দেখিস্ ফাঁসী।
ওমা, মনের দুঃখ মনে রইল
আমার হ'ল না স্বদেশী।
কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ী
পরো না মা বিলাতী শাড়ী ;
এ মিনতি করি মাগো,
ভুলো না স্বদেশী।

**বন্দে মাতরম্**

# জাতীয় পতাকা

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায়

মেদিনীপুর। ১৯৪২ সালেব আগষ্ট বিপ্লব তখন চলছে। এক বিপ্লবী দল সেদিন ছুটে চলছে থানা দখল করতে। দলের সামনে দৃঢ শীর্ণ হস্তে সগর্বে জাতীয পতাকা নিযে এগিযে চলেছেন এক স্থবিব বৃদ্ধা—নাম মাতঙ্গিনী হাজবা, বয়স ৭৩ বৎসব। বৃটিশ সৈন্য বাধা দিলো, বল্লো—জাতীয পতাকা তাদেব হাতে তুলে দিতে। দশ হাজাব লোকেব পবিচালিকা সেই বৃদ্ধা অকম্পিত-কণ্ঠে উত্তব দিলেন—প্রাণ দিতে পাবি পতাকা দেবো না। বর্বব সৈন্যের গুলীব আঘাতে বৃদ্ধা প্রাণ দিলেন—জাতীয পতাকা তুলে দিলেন না অনধিকারীর হাতে।… সেই সময়ের আব একটি ঘটনা। আসামেব দবং জেলাব গোহুর গ্রামে থানার উপব জাতীয পতাকা তুলতে যেযে কনকলতা নাম্নী একটি তেরো বছবের মেযে হাসিমুখে বন্দুকের গুলী বুক পেতে নিয়েছিল, তবু পতাকা হাতছাড়া করে নি। এমনি আরো কত ভাবত-মাযের আদরের দুলাল-দুলালী প্রাণ দিযেছে, হাসিমুখে কাবাগাবে নবকযন্ত্রণাকে বরণ করে নিযেছে জাতীয পতাকাব সম্মান বাখবাব জন্যে।

স্বাধীনতার দ্বাবদেশে উপনীত হযে এই জাতীয পতাকার ইতিহাস আব ব্যাখ্যা না জানা শুধু লজ্জার কথা নয, অপবাধ।

একটা জাতি যখন সম্মিলিতভাবে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করে, তখনই সে লাভ করে, জাতীয পতাকা ধারণের অধিকার। ১৯০৫ সালের আগে পর্যন্ত ভারতেব জাতীয মহাসভা বা কংগ্রেসের সংগ্রামেব কোন সিদ্ধান্ত ছিলো না; সংগ্রাম আরম্ভ হলো ১৯০৫ সালে—বড়লাট লর্ড কার্জনেব বঙ্গদেশ বিভাগের নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে তখন শুরু হলো তীব্র আন্দোলন। ফ্রান্সদেশের